CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

উপন্যাস

যোগাযোগ

সেলিনা হোসেন

পরিবারটি এখন চাঁদপুরে।

বাতাসে শ্বাস টেনে সরোজিনীর মনে হয়, ভালোই লাগছে। এ যাত্রা হয়তো একরকম বাঁচা হলো। ভবিষ্যতে আবার বাঁচার ধরন কেমন হবে কে জানে!

অনিমেষ মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, গ্রামটা এক চক্কর দৌড়ে আসি মা ?

অমিয়নাথ ছেলের হাত ধরে বলে, এখন না।

কেন বাবা ? অনিমেষ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে।

নতুন জায়গা তো। কেমন হবে তা আগে বুঝতে হবে।

অলংকরণ : অভিজিৎ চৌধুরী

AMARBOI.COM

বাবা চারদিক কী সুন্দর! গাছ-গাছালি, পাখি, ধান ক্ষেত, ছোট ছোট ঘর ? এখানে ভয় নেই বাবা।

ভয় তো মানুষ রে।

মানুষ! অনিমেষ থমকে যায়। আবার ভাবে, মানুষই তো ওদেরকে সংখ্যালঘু বলে। পাখি বা গাছ নয়। ও নিজের ভেতরে চুপসে যায়। তাহলে ওদেরকে কি অন্যরা ভয় পায় ? হয়তো পায়। কে জানে। একবার ভাবে বাবাকে জিজ্ঞেস করবে। পরে ভাবে, বাবাকে জিজ্ঞেস করে কী হবে! বাবাও এ প্রশ্নের উত্তর জানে না। পরে নিজেই নিজেকে বলে, মানুষকে অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে হয়। মানুষ যদি প্রশ্নের উত্তর না জানতে পারে তাহলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে! অনিমেষ মন খারাপ করে আকাশ দেখে। সূর্য দেখে বেলা আন্দাজ করে। তারপর সজনে ডালে বসে থাকা বুলবুলির দিকে তাকিয়ে বলে, বুলবুলি তোর পাছার লালটুকু আমাকে দিলে তা দিয়ে আমি একটি সূর্য বানাব! তারপর সবার সামনে থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, ও নিজেও এই প্রশ্নের উত্তর জানে না যে নতুন সূর্য বানানো যায় কিনা!

অমিয়নাথ ছেলের দিকে তাকিয়ে বলে, ওখানে গেলি কেন অনিমেষ ?

এমনি বাবা।

আমার কাছে আয়।

ওকে নড়তে না দেখে কড়া গলায় বলে, আমার কাছে আয় বলছি।

ও চুপচাপ কাছে এসে দাঁড়ায়। বাবার হাত ওর মাথা ছুঁয়ে রাখে। ও ঘাড় উঁচু করে বলে, তুমি কি আমাকে ভয় পাও ?

হ্যাঁ। অমিয়নাথের কণ্ঠস্বর ঘড়ঘড় করে। চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সবার দৃষ্টি অমিয়নাথের ওপরে গিয়ে পড়ে। সরোজিনী রাগত স্বরে বলে, ওকে ভয় পাওয়ার কী হলো ? ও কী করেছে ? কারও ক্ষতি তো করে নি।

তুমি কি ওর দৃষ্টি দেখে কিছু বোঝ না ?

দৃষ্টি!

ওর চোখের ভাষা পড়তে পারলে বুঝবে ও অন্যরকম ছেলে। দুষ্টু ছেলের মতো না।

এরজন্য ভয় পেতে হবে কেন ?

যারা অন্যরকম তাদের দেখলে তো চেনা যায় না। তাকে ভয়ই লাগে।

সরোজিনী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলে, তুমি কি ওকে খারাপ ছেলে বলছ ?

অমিয়নাথ বুকের কাছে দু'হাত জড়ো করে বলে, মোটেই না। ওকে ভয় ওর ভেতরে বেশিকিছু থাকার জন্যে। আমি ওকে আশীর্বাদ করি। ও যেন ঠিক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিম্ববতী মৃদু ধমক দিয়ে বলে, ছেলেটাকে নিয়ে বেশি ভাবিস না তো সরোজ। চল রান্নার ব্যবস্থা করি।

তখন অনিমেষ দু'হাত মাথার উপর তুলে বলে, এই গ্রামটি খুব সুন্দর জেঠিমা। আমরা যে গ্রাম থেকে এসেছি সেটার চেয়েও সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর মেঘনা নদী। আগের গ্রামটা ছেড়ে আমরা কষ্ট ভুলে গেছি। হই-হই-হই—

ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ঘুরপাক খায়। তারপর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, বাবা, আমি মেঘনা নদীতে মাছ ধরব। জাল দিয়ে ইলিশ মাছ। তুমি আমাকে একটা ডিঙি নৌকা বানিয়ে দিয়ো। দেবে তো বাবা ?

অমিয়নাথ ওর কপালে চুমু দিয়ে বলে, আমার পাগলা ছেলে।

ওকে এমন আদর করতে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা হারাণের গা জ্বলে যায়। দাঁত কিড়মিড় করে বলে, ওকে লাই দিয়ে মাথায় তুলছ। দেখবে বড় হলে ও ঠিকই একটা জেলে হবে। তখন বুঝবে মজা।

দাঁড়িয়ে থাকা সবাই ওর কথা শোনে। কেউ উত্তর দেয় না। ভাবটা এমন যে, ওর কথা ও বলুক। তাতে কারও কিছু আসবে যাবে না। সবার দৃষ্টি সুবোধনাথের ওপরে গিয়ে পড়ে। দ্রুতপায়ে হেঁটে আসছে সে। কাছে এসে দাঁড়ালে বিম্ববতী আগ্রহভরে জিজ্ঞেস করে, আমাদের জন্য তোমার কাছে কোনো খবর আছে ?

হ্যাঁ। ভালো খবর।

কী খবর দাদা ?

রণবী সাহা আমাদের থাকার জন্য একটি বেশ বড় বাড়ি ঠিক করে দিয়েছে। চল দেখবি।

অনিমেষ আকস্মিকভাবেই জিজ্ঞেস করে, কতদিন থাকতে পারব জ্যাঠা ?

কত দিন!

দু'ভাই পরস্পরের দিকে তাকায়। কলাদী গ্রামে এসে ওরা দেখেছে দেশভাগ ও দাঙ্গার কারণে অনেক বাড়ি পরিত্যক্ত পড়ে আছে। সেসব শূন্য ঘরে বাতাস হা-হা ফেরে। দেখাশোনার জন্য লোক নেই। রণবী সাহার নিজের বাড়িটাও এত বড় যে তার পক্ষে ঠিকঠাক রাখা সম্ভব হচ্ছে না। যারা চলে গেছে তাদের বলেছে, দেখেশুনে রাখতে। কিন্তু রাখবে কী করে! এটি মোটেই সহজ কাজ নয়।

অনিমেষ আবার প্রশ্ন করে, কতদিন থাকতে পারব জ্যাঠা ? আবার যেতে বলবে না তো ?

হ্যাঁ, বলতেও পারে।

তাহলে তোমরা জানো না যে কতদিন।

তা ঠিক। আমরা জানি না।

না জানাটা খুব খারাপ। জানলে মন ভালো থাকে।

ঠিক বলেছিস বাবা।

বিম্ববতী ওকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দেয়। ও একটুখানি সময় বিম্ববতীর বুকে নিজের মাথা ঠেকিয়ে রাখে। ভাবে, ভালোবাসার জায়গা তো এমন হওয়াই উচিত। যেখানে মাথা ঠেকালে সব দুঃখ উড়ে যায়। উড়ে যায় বেঁচে থাকার কষ্ট। দিনযাপন বকুল ফুলের গন্ধ নিয়ে ফুটে ওঠে।

বিম্ববতী ওর মাথা তুলে ধরে বলে, কিছু বলবি রে মানিক ?

না, জেঠিমা। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।

আমার মনে হলো তোর শরীরের সবখান থেকে কথা আসছে। শুধু আমি বুঝতে পারছি না।

যাহ, এমন হয় বুঝি ?

হয়-হয়। তুই বুঝবি না। আমরা বুঝি। আমরা যে দেখতে দেখতে বুড়ো হয়েছি।

শুনতে শুনতেও বুড়ো হয়েছ জেঠিমা। সেজন্য যে কথা বুকের মধ্যে বুড়বুড় করে তাও শুনতে পাও।

ওরে মানিক, তোর এত বুদ্ধি!

বিম্ববতী কেঁদে বুক ভাসায়। সরোজিনী বিম্ববতীর হাত ধরে বলে, চলো দিদি, আমরা রণবী সাহার বাড়িটা দেখে আসি।

সুবোধনাথ বলে, রণবী সাহার বাড়ির পাকা ভিটায় আমাদের ঘর তুলে থাকতে হবে। ঘর তোলার সরঞ্জামও আমাদের জন্য জোগাড় করে রাখা হয়েছে।

বেশ কথা। তাহলে আমরা বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে একবারে চলে যাই। গিয়ে একটা কুঁড়েঘর তোলার কাজে লাগি। মাথা গোঁজার ঠাঁই তো হলো।

অনিমেষ চেঁচিয়ে বলে, মাথা গোঁজার ঠাঁই, মাথা গোঁজার ঠাঁই। চলো দাদা আমরা দৌড়ে পৌঁছে যাই রণবী কাকুর বাড়িতে।

পথ চিনবি ?

খুঁজে নেবো। এসো।

ও হারানের হাত ধরে টান দেয়। হারান ওর দিকে গরম চোখে তাকায়, দৌড়ালেই হলো! বোঁচকা টানবে কে ?

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

এই আমি একটা পিঠে নিলাম। আমি বোঁচকাও টানতে পারি, বাড়িও খুঁজতে পারি। এখন দৌড় দেব। সবার আগে বাড়িটা আমারই দেখতে হবে। হারান দাদা থাকুক। গেলাম।

অনিমেষ কারও দিকে তাকায় না। দাঁড়িয়ে থাকা অন্যরা একমুহূর্ত ওর ছুটে যাওয়া দেখে। তারপর যে যার মতো বোঁচকা-বুঁচকি হাতে নিয়ে যাত্রা করে। মনে হয় এ যাত্রায় বেঁচে যাওয়া পথটুকু পার হতে পারলে সামনে আর বিপদ নেই। এখন গুছিয়ে বসার সময়।

বাড়ির জায়গা দেখে সবাই খুশি। ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি করে এদিক-ওদিক যায়। সরোজিনী আর বিম্ববতী ইট কুড়িয়ে চুলো পাতে। শুকনো ডালপালা নিয়ে আসে। আশপাশে মরা গাছের ডাল পড়ে রয়েছে। নিয়ে আসতে কষ্ট হয় নি। রণবী সাহার লোক এসে চাল-ডাল-তেল-নুন-ডিম-মসলা দিয়ে গেছে। অনায়াসে দু'চার বেলা কেটে যাবে। সরোজিনী বলে, দিদি আমরা এখানে আরও দু'একটা ঘর তুলে ভালোই থাকতে পারব। অনেক জায়গা। বেশ লাগছে আমার।

বিম্ববতী চুপ করে থাকে। সরোজিনীর কথায় সায় দিতে পারে না। তার কেবলই মনে হয় কারও মুখে দাঁত গজাচ্ছে, যে একটা মরণ কামড় দেবে।

দিদি, এমন চুপ করে আছ যে ? তোমার জায়গাটি ভালো লাগে নি ?

লেগেছে রে সরোজ। কিন্তু কতদিন থাকতে পারব ? বাড়ির মালিক তো বেচা-বিক্রির কথা ভাববে ? রণবী সাহাকে তো তেমন দায়িত্ব দিয়েই ওরা গেছে।

এবার চুপ করে থাকে সরোজিনী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে নিঃশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত হয় মেঘনা নদীর দিক থেকে উড়ে আসা বাতাস। দীর্ঘশ্বাস লম্বা হয়। লম্বা হয়ে ঘুরপাক খায় কলাদী গ্রামের ওপর। বিম্ববতী বিষয়টি নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। বলে, আমরা খিচুড়ি রেঁধে ফেলি সরোজ। ছেলেমেয়েগুলো একটু পরে খেতে চাইবে।

আমাদের স্বামীরাও খেতে চাইবে দিদি।

সরোজিনীর চেহারায় ক্লান্ত-বিষণ্ন হাসি ফুটে ওঠে। স্বপ্ন ফুরিয়ে গেলে মানুষ যেমন বিবর্ণ হয়, সেই বিবর্ণতা এখন সরেজিনীর পুরো অবয়বে। বিম্ববতী গভীর ভালোবাসায় ওর হাত ধরে বলে, আয়।

দুজনে খিচুড়ি রান্না শেষ করে। ডিমের ভুনা করে, সঙ্গে আলু ভর্তা। দু'জনের চোখে বারবার জল আসে। দুজনেই ভাবে, এমন জীবন কি ওরা চেয়েছিল! হায়, ছোটবেলার সুখ-দুখের পাখি আর ডাকাডাকি করিস না। সরোজিনী যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলে, দিদি আমি চান করতে যাচ্ছি। তুমি আমার জন্য একমুঠো শুকনো মরিচ তেলে ভেজো।

শুধু তোর জন্য কেন, আমার জন্যও ভাজবি রে সরোজ। শুকনো মরিচ ছাড়া খিচুড়ি খেলে আমার মনে হয় খিচুড়ি খাওয়াই হলো না।

এ জন্যই তো তোমার সঙ্গে আমার মনের এত মিল। দুজনে একরকম করে খিচুড়ি খাওয়ার মজা পেতে চাই। দিদি গো আর জনমে তুমি ঠিকই আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে।

বিম্ববতী মৃদু হাসে। সে হাসিতে আনন্দ মিশে থাকে। কখনো কখনো মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যে উপভোগের আনন্দ মানুষকে অন্য পৃথিবীতে নিয়ে যায়। বিম্ববতী ক্ষণিকের সুখ এখন মহাকালের পৃথিবী।

ছুটে আসে ছেলেমেয়েরা।

মা রান্না হয়েছে ? ভীষণ খিদে পেয়েছে।

তোরা চান করবি না ?

করেছি তো। অনেকক্ষণ ধরে পুকুরের জল তোলপাড় করেছি।

কী যে সুন্দর পুকুর। চারদিকের গাছপালার ছায়ায় শীতল হয়ে আছে জল।

হ্যাঁ মা ঠিক। পুকুরে নামলে মনে হবে এখন বুঝি শীতকাল।

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

তোরা দেখছি এখানে এসে ভীষণ খুশি। যে গ্রামটা ছেড়ে এলি তার জন্য মন খারাপ করছে না ?

শীলা আর দোলা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে, করছে। গ্রামের জন্য করছে না। গ্রামের বন্ধুদের জন্য করছে।

অনিমেষ নিজেও চোখ মুছে বলে, মাগো, বন্ধুদের জন্য আমার মনটাও কেমন জানি করছে। তোমাকে তো বলি নি যে সেলিম আমার হাত ধরে অনেক কেঁদেছে। বলেছে, তোরা যাচ্ছিস কেন ? যাবি না। আবার বলেছে, আমাদের ভুলে যাস না। যখন খুশি তখন বেড়াতে আসবি। আরও বলেছে, ও বড় হলে আমাদের এখানে বেড়াতে আসবে।

বলতে বলতে অনিমেষের দৃষ্টি ম্লান হয়ে যায়। ওর বিষণ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সরোজিনী বলে, তোরা চুলোর ধারে বোস। আমি চান করে এসে তোদেরকে খেতে দেব।

তাহলে কলাপাতা কেটে নিয়ে আসি। আজ আমরা কলাপাতায় খিচুড়ি খাব।

হ্যাঁ, দাদা চল চল কলাপাতা কেটে আনি।

শীলা-দোলা মহা উৎসাহে চুলোর পাশে রাখা বটিটা হাতে তুলে নেয়। বলে, আজ আমাদের বনভোজন। নতুন গাঁয়ে নতুন দিন।

ওদের উচ্ছ্বাসের হাসি শুনতে শুনতে সরোজিনী পেছন ফিরে দেখে। ভাবে, পুকুরে ডুব দিলে ওদেরকেই ছোঁয়া হবে। যেতে যেতে সরোজিনী বারবার বলে, ওদের যেন বুকে ধরে রাখতে পারি। ওদের যেন হারাতে না হয়।

শীলা আর দোলাকে কলাপাতা কেটে দিয়ে অনিমেষ বলে, তোরা পাতাগুলো ধুয়েমুছে রেডি কর। মা চান করে আসুক। আমি ঘর থেকে আসছি। ও একদৌড়ে নতুন ঘরে গিয়ে ঢোকে। কাঁচা বাঁশের বেড়া থেকে সোঁদা গন্ধ আসছে। ও বেড়ার কাছে গিয়ে নাক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গন্ধ শোঁকে। নতুন বাঁশের প্রাণ-মাতানো গন্ধে ওর মাথা চনমন করে। পরক্ষণে বুকে দ্রুম্‌দ্রুম শব্দ হয়, কত দিন। শব্দ বাড়তে থাকে। ওটা আর থামতে চায় না। ও ঘরের চালের দিকে তাকায়। শুকনো খড় গুটিশুটি হয়ে কোথাও বাঁশের গায়ে লেগে আছে। ছাউনি ঠিকমতো করা হয় নি। আগামী দিন করা হবে। ঘরামিদের সঙ্গে ও ঘরের চালে উঠবে। দেখবে কেমন করে নতুন ছাউনি ওঠে। ভাবে, নতুন ঘরকে বরণ করতে হয়। নইলে ঘর দুঃখ পাবে। তখন বুঝতে পারে ওর বুকের ভেতরে আর দ্রুম্‌দ্রুম শব্দ নেই। ও বাইরে গিয়ে মন ভরে বুনোফুল তুলে এনে বেড়ার গায়ে লাগিয়ে দেয়। সুন্দর করে সাজায়। ফুলের মাঝে পাতা দেয়। যেন একটি ফুলভরা লতাগাছ বেড়ার গায়ে লতিয়ে উঠেছে। নিজে নিজেই বলে, বেশ সুন্দর হয়েছে। ভাবে, বাবা আর জ্যাঠা এসে বলবে আমাদের ছেলেটা ফুলের শিল্পী হয়েছে। চান করে ফিরে সরোজিনী ঘরের দরজায় দাঁড়ায়। বলে, বাহ, কী সুন্দর! সুন্দর গন্ধ আসছে রে অনিমেষ। তোকে পেয়ে ফুলগুলো ঘড়া উজাড় করে গন্ধ ঢেলে গিয়েছে।

হি-হি করে হাসে অনিমেষ। মায়ের কথা শুনে মজা পায়। সরোজিনী শুকনো গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ে। মোটা চুলের গোছা পিঠের ওপর ফিঙে পাখির লেজের মতো ছড়িয়ে আছে। ও ভাবে, মায়ের চুলেও ফুল গুঁজে দিতে হবে।

তোরা চুলোর ধারে যা মানিক, আমি আসছি।

ও মায়ের দিকে তাকিয়ে নিজের কথা বলে, মাগো, মানুষের ফেলে যাওয়া মাটিতে ঘর পেয়েছি আমরা। এখন ঘরটা তো নিজের মতো করতে হবে। তুমি কী বলো ? আমি উঠোনেও ফুলগাছ লাগিয়ে ভরিয়ে দেব। তোমার আর জেঠিমার জন্য তুলসী গাছ লাগাব। তোমরা তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ দেবে। উঠোনের চারপাশে জবা গাছ লাগিয়ে দেব। দেখবে সামনের বরষায় সব গাছে ফুল ফুটবে। বাবা আর জ্যাঠা মধ্যরাতে ঘুম থেকে উঠে উঠোনে নামবে। ভাববে, ফুলের এত গন্ধ বুকে নিয়ে কেউ কি ঘুমুতে পারে! তখন আমার ভীষণ আনন্দ হবে। মনে হবে, আকাশের

AMARBOI.COM

সবটুকু জ্যোৎস্না শুধু আমার। আর কারও না। জ্যোৎস্নার ভাগ আমি কাউকে দেব না মাগো।

সরোজিনী হাঁ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে বয়সের চেয়ে বেশ লম্বা হয়েছে ও। বুদ্ধিও অনেক। সব ছেলেমেয়ের চেয়ে জ্ঞানগম্যি বেশি।

মাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলে, দেখছ কী মা ?

তোর বাবা ঠিকই বলে। তোকে আমাদের দেখতে হয়। এখানে এসে মনে হচ্ছে মেঘনা নদীর পথে আসার সময় নদী তোকে আশীর্বাদ করেছে। বলেছে, অনেক বড় হতে হবে।

অনিমেষ লাজুক হেসে বলে, এবার যদি স্কুলে ভর্তি হতে না পারি তাহলে আর বড় হওয়া হবে না আমার।

বালাই ষাট, এমন কথা মুখেও আনবি না। তোর স্কুলে ভর্তি হওয়া কে ঠেকাবে!

ও মাকে বলে, ওই যে বাবা আর জেঠু আসছে। তাদের গিয়ে বলি যে, খিচুড়ি রান্না হয়েছে। তাড়াতাড়ি আসো। আমরা সবাই মিলে খিচুড়ি খাব।

সরোজিনীর মনে হয় ছেলেটা ওর সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচল। মায়ের প্রশংসায় ও আরও লাজুক হয়েছে। সরোজিনী দেখতে পায় দুই মেয়ে কলাপাতা বিছিয়ে ঘরের চালার নিচে খাবার জায়গা করেছে। বিম্ববতী খিচুড়ির হাঁড়ি নিয়ে জায়গাটা ভরিয়ে দিয়েছে। যে কড়াইতে ডিম রান্না হয়েছে সেটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সরোজিনী বলে, তুমি চান করতে যাও দিদি। কড়াই আমাকে দাও। বিম্ববতী কথা না বলে কড়াইটা ওকে দেয়। সরোজিনীর মনে হয় এতক্ষণ আগুনের পাশে থেকে বিম্ববতী ঘামিয়ে গেছে, খানিকটুকু ক্লান্তও হয়েছে। বেচারা! বিম্ববতী চান করে ফিরে এলে সবাই খেতে বসবে। ততক্ষণে সরোজিনী চুলোর আগুন নিভিয়ে দেয়। লোহার বড় কড়াইয়ে কাঠকয়লা তুলে রাখে। হাঁড়িকুড়ি গুছিয়ে ঘরে নিয়ে যায়। জায়গা পরিষ্কার করে। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে দেখে ওরা মুখে মুখে ছড়া কাটছে। বেশ লাগছে ওদেরকে। সবাই মিলে খেতে বসলে দেখতে পায় বেলা গড়িয়ে গেছে। সুবোধনাথ মুখে খিচুড়ি পুরে বলে, বেশ কাটল দিনটা। কী বলিস অমিয় ?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ দাদা। এরচেয়ে ভালো দিনতো আমাদের কাটে নি।

আর কেউ কথা বলে না। শুধু বসে থাকে দুই নারী। স্বামীদের খাওয়া হলে তবেই তারা খেতে বসবে। দুজনের ভীষণ খিদে পেয়েছে। তারপরও ধৈর্যের অপেক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটে। একসময় সবার খাওয়া শেষ হয়। দুজনে মুখোমুখি খেতে বসে। সরোজিনী আকস্মিকভাবে জিজ্ঞেস করে, দিদি কাল রাতে কী স্বপ্ন দেখেছ ?

স্বপ্ন! বিম্ববতী কপাল কুঁচকে রেখে বলে, মনে পড়ছে না।

তাহলে খুব গভীর ঘুম হয়েছে, তাই না?

তাও না রে সরোজ। বারবার ঘুম ভেঙেছে। উঠেছি। জল খেয়েছি।

তাহলে মাদুর পেতে দেব। খাওয়া শেষে খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ো।

বেলা গড়িয়েছে। এখন আর শোব না রে।

তাহলে কী করবে ?

চালের ধান বাছব। ঝাড়ব। ঘর গোছাব।

নাহ, তোমার সঙ্গে পারা যায় না।

বিম্ববতী ঘাড় নিচু করে খিচুড়ি শেষ করে। অল্প একটু ভাতে ডিমের কুসুম মাখিয়ে একটু একটু করে খায়। বলে, দেখ ভাতগুলোকে ধানের শীষের মতো লাগছে। সরোজ এক গ্রাস দেব ?

না দিদি, তুমি শেষ করো। আমার হয়ে গেছে।

আমি একটু দেরিতে উঠি ?

দিদি তোমার কী হয়েছে ?

জানি না কী হয়েছে। কিন্তু বুক খাঁ-খাঁ করছে।

আর এক গ্লাস জল দেব ?

দে। জল খেয়ে জীবন জুড়াই।

বিম্ববতী কেমন করে যেন হাসে। সরোজিনীর বুক ধক করে ওঠে।

এক গ্লাস জল বিম্ববতীর ভাতের থালার সামনে রেখে এঁটো বাসনকোসন নিয়ে ধুতে বসে। হঠাৎ করে মনে হয় ওর বুকটাও জানি কেমন করছে। কাঁদতে পারলে শান্তি হতো!

সাত দিনের মাথায় অমিয়নাথ ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে। বাড়ি ফিরে সবাইকে ডেকে বলে, গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা হয়েছে, তোদের তিন ভাইয়ের ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

লাফিয়ে ওঠে হারান। বলে, আমি আর পড়ালেখা করব না বাবা। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি। যথেষ্ট হয়েছে। আর না। দেওভোগে থাকতেও স্কুল আমার ভালো লাগে নি।

তোর কী হয়েছে বল ?

কী আবার হবে। বলেছি তো, আমার পড়ালেখা ভালো লাগে না।

কেউ কিছু বলেছে ?

না, কে কী বলবে ? তাছাড়া আমাকে কথা বলে কেউ পার পাবে না। আমি কারো কথার ধার ধারি না।

তবে ? লেখাপড়া না করলে চলবে কেন ?

আমি তোমাদের সঙ্গে কাজ করব বাবা ? তোমরা যে সোনা-রুপার গয়না গড়াও সেটা করতেই আমার ভালো লাগবে। তোমরা আমাকে কাজ শেখাও।

আচ্ছা আগে খাওয়াদাওয়া করে নে। তারপর দেখা যাবে।

অনিমেষ দৌড়ে মায়ের কাছে যায়।

মা ভাত কই ? জেঠিমা-জেঠিমা— ও জেঠিমা—

অনিমেষ নিজেই রান্নাঘর থেকে ভাতের হাঁড়ি, ডালের পাতিল নিয়ে আসে। কাঁসার থালা-গ্লাস এনে সাজায়।

অনিমেষ ছেলের কাজ দেখে খুশি হয়ে বলে, তুই তো মাকে বেশ সাহায্য করছিস রে। লক্ষ্মী ছেলে আমার।

দেখতে পাই মা-জেঠিমা সারা দিন কাজ করে। মাঝে মাঝে আমার খুব মায়া হয় বাবা। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে মা-জেঠিমার কাজে সাহায্য করব।

সরোজিনী হাসতে হাসতে বলে, ভালোই বলেছিস। এরপর তোকে আমি ঢেঁকিতে উঠিয়ে দেব। মা-ছেলেতে চাল কুটে পিঠা বানাব।

খুব মজা হবে, খুব মজা।

শীলা-দোলা দু'হাতে তালি বাজায়।

হয়েছে, অনেক হয়েছে। এবার খেতে আয় তোরা।

খেতে খেতে সুবোধনাথ খবরটা সবাইকে জানায়। বলে, মতলব বাজারে আমরা একটি দোকান ঘর কম দামে কিনতে পারব। কথাবার্তা ঠিক হয়েছে। মুসলমানরাও আমাদের বেশ সহযোগিতা করছে। মনে হচ্ছে এখানে আমরা ভালোভাবেই থাকতে পারব।

সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অমিয়নাথ এক ঢোক জল খেয়ে বলে, বাজারের স্বর্ণকাররা আমাদের দুই ভাইয়ের সোনার কাজ দেখে খুব খুশি। ওরা বলেছে, আমরা দক্ষ কারিগর।

বাবা, এই খুশির খবরে আমাদেরকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে। আজকে আর ছাড়াছাড়ি নেই।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি বাজার থেকে রসগোল্লা নিয়ে আসব, নাকি জিলাপি খাবি ?

রসগোল্লা জেঠু।

তাই হবে। দেখব কে কত খেতে পারিস।

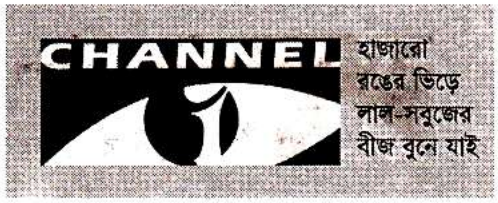

AMARBOI.COM

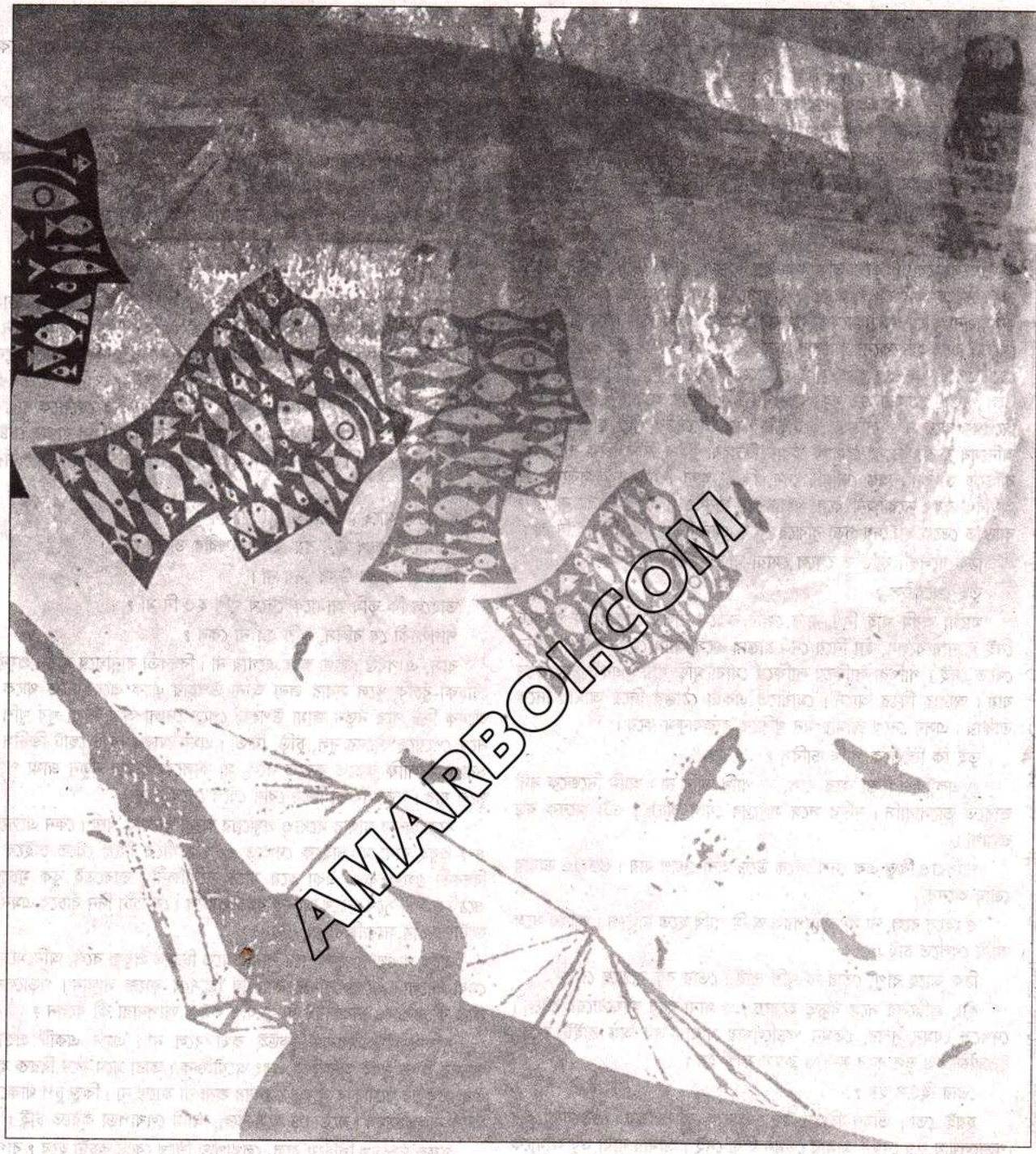

AMARBOI.COM

বিম্ববতী সবার দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসের ধ্বনি কান পেতে শোনে। ভাবে, চারপাশে এত প্রাণের কাকলী তারপরও বুক খাঁ-খাঁ করে কেন? দিন গড়াচ্ছে। রাত কাটছে। বয়স বাড়ছে। চোখের নিচে কালি জমছে। সবইতো ঠিক আছে। তবু কত কিছু যেন পাওয়া হয় নি, এমন বেদনাবোধ আছে। এই জীবনে আর সেসব কিছু পাওয়া হবে না। এভাবেই ফুরোবে দিনের আলো। অন্ধকারের নিচে চাপা পড়ে যাবে। থাক, আর ভাববে না। একে একে খাওয়া শেষ হয়। স্বামীরা উঠে গেলে এঁটো থালা টেনে নেয় দুই নারী। সরোজিনী বলে, খেতে ইচ্ছে করছে না দিদি। আজ না হয় নাই খেলাম।

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

থাক, তাহলে আমিও খাব না।

কেন, তোমার আবার কী হলো?

জ্বর-জ্বর লাগছে। বোধহয় রাতে কাঁপনি দিয়ে জ্বর আসবে।

দেখি। সরোজিনী বিম্ববতীর কপালে হাত রাখে। তারপর গম্ভীর স্বরে বলে, তোমার কিছু হয় নি দিদি। জ্বর তোমার মনে। তুমি বোধহয় ছেলের কথা খুব ভাবছ। প্রফুল্লকে একটা টেলিগ্রাম পাঠালে ও এসে মাকে দেখে যাবে।

বিম্ববতী সরোজিনীর হাত চেপে ধরে বলে, খবরদার না। ওর মুখ দেখার আমার দরকার নেই।

বিম্ববতী আঁচলে চোখ মোছে।

সরোজিনী কথা বাড়ায় না। মূর্তিমতী বিম্ববতীর সামনে চুপ করে বসে থাকে। যেন চুপ করে বসে থাকাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় কাজ। পৃথিবী উল্টে গেলেও দেখা যাবে সরোজিনী মাটির সঙ্গে সেঁটে আছে। সে আর কোনোদিন নড়বে না। তাদের খিদে পাবে না। তারা ভাতের থালা সামনে নিয়ে সারা জীবন বসে থাকবে। বলবে না, নুন পাব কি ভাত খাওয়ার জন্য, পান্তা কিংবা গরম যে ভাতই হোক না কেন? মুখোমুখি বসে থাকা দু'নারীর অবয়ব আস্তে আস্তে ছায়া হয়ে যায়।

দিন গড়ায়।

ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা হয়। সবাই খুশি। ওদের নতুন একটি জগৎ হয়েছে। সেখানে পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা আছে, শরীরচর্চা এবং গানবাজনা আছে। অনিমেষের হিসেবটা সহজ। স্কুলের পরে বিকেলে ফুটবল খেলে। রাতে হারিকেনের আলোয় পড়তে বসে। শীলা আর দোলা বলে, স্কুলে যেতে পেরে আমাদের খুশির সীমা নেই জেঠি। মাগো কত বন্ধু! তোমরা যখন স্কুলে পড়েছ, তোমরা এত বন্ধু পাও নি। ঠিক বলেছি আমরা? ওরা উত্তরের অপেক্ষা করে না। বাড়িময় ছুটোছুটি করে নিজেদের খুশি ছড়িয়ে দেয়। অনিমেষ ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করায় টিচাররা ছুটির দিনে ওকে নিজেদের বাড়িতে ডাকেন। অঙ্ক দেখিয়ে দেন, কিংবা অন্য বিষয় যেটা বুঝতে ওর অসুবিধা হয়। সরোজিনী বলে, এখানকার মানুষগুলো বেশ ভালো না রে? বাড়িতে ডেকে ছাত্রদের পড়া বুঝিয়ে দেয়, এমন টিচার আগে দেখি নি রে।

ঠিক বলেছ। বাড়িতে গেলে মোয়া-মুড়িও খেতে দেন স্যাররা।

তুই খেয়েছিস?

মাগো আমি খাই নি। স্যার জোর করলে বলি, স্যার আমি পকেটে নেই? স্যার বলেন, হ্যাঁ নিয়ে নে। রাস্তায় এসে আমি মোয়ামুড়ি পাখিদের খেতে দেই। পাখিরা লাফিয়ে লাফিয়ে মোয়া মুড়ি খায়। একটু দূরে উড়ে যায়। আবার ফিরে আসে। মোয়াতে একটা ঠোক্কর দিয়ে আমার দিকে তাকায়। এসব দেখে আমার মন খুশিতে বাকবাকুম করে।

তুই কি নিজেকে পাখি ভাবিস?

ও একটুক্ষণ চিন্তা করে বলে, না পাখি ভাবি না। আমি নিজেকে নদী ভাবতে ভালোবাসি। নদীর সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে। ওটা অনেক বড় জায়গা।

পাখিরাও কিন্তু এক দেশ থেকে উড়ে অন্য দেশে যায়। ওদেরও ডানার জোর অনেক।

ও হেসে বলে, না মা, তারপরও আমি পাখি হতে চাই না। পাখির সঙ্গে আমি খেলতে চাই।

ঠিক আছে বাপু, তোর যা খুশি তাই। তোর বন্ধু হয়েছে রে?

হ্যাঁ, হারিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। ও থানা কৃষি অফিসারের ছেলে। দেখতে যেমন সুন্দর, তেমন পড়ালেখায় মাথা। সব অঙ্ক রাইট করে। ইংরেজিতেও ভুল করে না। ও ক্লাসে ফার্স্ট হয়।

তোর হিংসে হয়?

হয়ই তো। ভীষণ হিংসে হয়। আবার দুঃখও হয়। ওর বাবা ওর পড়ালেখায় যত্ন নেয়। আমার তেমন বাবা নেই। আমার বাবা শুধু আমাকে ভাত দেওয়ার কথা ভাবে। বিদ্যা দিতে পারে না।

আহ, চুপ কর। তোর বাবা শুনলে কষ্ট পাবে।

না, এমন কথা আমি বাবাকে কখনো বলব না। বাবা আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাখি। ডানা মেলে ছায়া দেয়।

হা-হা করে হাসে অনিমেষ। হাসতে হাসতে বলে, আর তুমি আমার ছোট্ট পাখি টুনটুনি।

ওর হাসি শুনে ছুটে আসে শীলা আর দোলা।

মা ছোড়দা তোমার কাছ থেকে এত আদর নিচ্ছে কেন?

নেবেই তো। তোদের রাগ কেন? তোরা পারলে তোরাও নে। কে নিষেধ করেছে?

শীলা-দোলা থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। হা-হা করে হাসে অনিমেষ।

হেরে গেলি, হেরে গেলি। এই যে আমি মাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তোরা এখন মায়ের কোলে ঢুকে যা।

দু'বোন সরোজিনীর দু'পাশে বসে মায়ের গালে চুমু দেয়।

কখনো এমন সরল মুহূর্ত অনেক ঝড়-ঝাপটা দূরে সরিয়ে দেয়।

বছর গড়ানোর মাথায় নদীয়া থেকে প্রফুল্ল আসে। সঙ্গে একগাদা বোঁচকা-বুঁচকি। প্রথম ধাক্কায় সুবোধনাথের মনে হয় ও কেন এসেছে কে জানে! শরীর ভারিক্কী হয়েছে, মেদ জমেছে বেশ। অনিমেষের আকস্মিকভাবে মনে হয় দাদাকে কি ছোটখাটো হাতির মতো লাগছে? যদিও হাতি ও সামনাসামনি দেখে নি, ছবিতে দেখেছে মাত্র। বিম্ববতীর ছেলেকে দেখে প্রথমে খুশি লাগে, তারপরে মন খারাপ হয়। নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। প্রফুল্ল দু'তিন বার প্রশ্ন করে, মা তোমার কি শরীর ঠিক নাই?

না, ঠিক আছে। ভালোই তো আছি।

তোমাকে দেখে মনে হয় তোমার শরীর ভালো নেই।

বিম্ববতী প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

তাহলে কি তুমি আমাকে দেখে খুশি হও নি মা?

পাগল কী যে বলিস, খুশি হব না কেন?

ব্যস, এ পর্যন্ত। কথা আর এগোয় না। বিম্ববতী রান্নাঘরে যায়। প্রফুল্ল বোঁচকা-বুঁচকি খুলে সবার জন্য আনা উপহার একে একে দিতে থাকে। অনেক দিন পরে নতুন জামা উপহার পেয়ে দোলা আর শীলা খুব খুশি। সঙ্গে পেয়েছে কানের দুল, চুড়ি, ফিতা। এমন আরও ছোট ছোট জিনিস। ওরা লাফালাফি করতে করতে বলে, মা কালকে আমরা নতুন জামা পরে স্কুলে যাব। নতুন ফিতা দিয়ে বেণি বেঁধে দেবে কিন্তু।

সরোজিনীর মাথার মধ্যেও প্রফুল্লের আসা ঘুরপাক খায়। কেন এসেছে ও? শুধুই বাবা-মা-ভাইকে দেখতে? নাকি মাকে নিয়ে যেতে চাইবে? বিম্ববতী গেলে বড্ড একা হয়ে যাবে সরোজিনী। ভাবতেই বুক মুচড়ে ওঠে। দুজনে সুখে-দুঃখে অনেক বছর কাটাল। যে কটা দিন বাঁচবে এমনই কাটাতে চায় সরোজিনী।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পরে পান চিবুতে চিবুতে প্রফুল্ল বলে, অনিমেষের মেধা ভালো। ওকে সোনার কারিগর হিসেবে কাজে লাগান। পড়ালেখা করে কী করবে। চাকরিরই বা সুযোগ কই? আপনারা কী বলেন?

সুবোধনাথ-অমিয়নাথ কেউই কথা বলে না। এমন একটি প্রস্তাব তাদের কাছে খুবই আকস্মিক এবং অযৌক্তিক। তারা মনে মনে বিরক্ত হয় এবং প্রফুল্লর মনোভাব আরও বোঝার জন্য রা কাড়ে না। কিন্তু চুপ থাকতে পারে না অনিমেষ। নড়েচড়ে বসে বলে, আমি লেখাপড়া করতে চাই।

প্রফুল্ল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, লেখাপড়া শিখে কোন কচুটা হবে? বাপ-কাকার ব্যবসায় থাকলে তো পৈতৃক ব্যবসা টিকে যাবে। বরং ঠিকমতো করতে পারলে ব্যবসা রমরমা হবে।

হারান দাদা পৈতৃক ব্যবসায় গিয়েছে। দাদা পৈতৃক ব্যবসার হাল ধরেছে। দাদাই করুক। সবাই মিলে এক জায়গায় যেতে হবে নাকি?

প্রফুল্ল রাগে গঁ-গঁ করে। অনিমেষের দিকে কড়া চোখে তাকায়। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে সামলে নেয়। তারপর কথা ঘুরিয়ে বলে, এই দেশের অবস্থা হিন্দুদের বসবাসের উপযোগী নয়।

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

এই দেশে তোমরা থাকতে পারবে না।

আমার বাবা-জেঠুও তোমার কাছে গিয়ে থাকতে পারে নি দাদা। ইন্ডিয়াও আমাদের বসবাসের জায়গা নয়।

এক চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেব বদমাশ। বেশি কথা বলতে শিখেছিস।

সরোজিনী মুখ কালো করে বলে, ছোটবেলা থেকেই ও একটু বেশি বোঝে প্রফুল্ল। ওর বুদ্ধি বেশি। স্কুলে ফার্স্ট হয়।

তাহলে তো আপনার ছেলে লাটবাহাদুর হবে কাকি। আমি আপনাদের ভালোর জন্যই বলেছিলাম। দেখবেন, এ দেশে বারবার দাঙ্গা লাগবে। হিন্দুদের কচুকাটা করবে মুসলমানরা।

দাঙ্গা লাগলে লাগবে। তাতে তোমার কী, তুমি তো আর এ দেশে থাকবে না যে তোমার মাথাটা কেটে নেবে। বলেই এক লাফে উঠোন পার হয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায় অনিমেষ।

প্রফুল্ল দাঁত কিড়মিড় করে বলে, এই বয়সে পেকে ডেঁপো হয়ে গেছে। খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ওকে পেটানো উচিত।

বিম্ববতী মুখ কালো করে বলে, ও কি কথাগুলো মিথ্যে বলেছে প্রফুল্ল ?

মা তুমিও ওর দিকে ?

যা সত্যি তা তোকে ধরিয়ে দিলাম।

থাক, আমাকে আর শেখাতে হবে না। তোমরা কী চাও তা আমার বোঝা হয়ে গেছে।

রাগে গরগর করতে করতে আরও দু'খিলি পান মুখে পুরে প্রফুল্ল। কারও দিকে তাকায় না। অমিয়নাথ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। নিস্তব্ধতা ভাঙতে মাথা তুলে বলে, আমরা এখানে ভালো আছি প্রফুল্ল। লোকজনের সহায়তা পেয়ে ঘরবাড়ি পেয়েছি। দোকানও দাঁড় করাতে পেরেছি। ব্যবসাও খারাপ যাচ্ছে না। কী বলো দাদা ?

সুবোধনাথ মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, তাইতো। পৈতৃক বাড়িটা নিজেরা বিক্রি না করলে কেউ তো আমাদের ওঠাতে পারত না। ভুলতো নিজেরাই করেছিলাম।

কথাটা ঠিক বললে না বাবা। বাড়িটা যে দখল হয়ে যেত না তা তোমরা বলতে পার না। সবই হতে পারত। দেশভাগের নিষ্ঠুরতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। ছেচল্লিশের দাঙ্গার কথা তোমরা কি ভুলে গেছ ? নোয়াখালীতে গান্ধী এসেছিলেন। তিনি এই চাঁদপুর থেকে লঞ্চে করে ফিরে গিয়েছিলেন। সেই দাঙ্গার কথা তোমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় বাবা। এমন দাঙ্গা বারবারই লাগতে পারে। ওই দাঙ্গার পরই তো তোমরা ঠিক করেছিলে যে এ দেশে থাকবে না।

তখন তো ভারতের অনেক জায়গায় দাঙ্গা হয়েছিল। শুধু নোয়াখালীর কথা বলছিস কেন ?

কারণ নোয়াখালী আমাদের বাড়ির কাছের এলাকা। আমরা পাঞ্জাবের দাঙ্গা দেখি নি। বিহারও না।

তাহলে বোঝ তখনকার উন্মাদনা অন্যরকম ছিল। এখন তো দেশ ঠান্ডা হয়েছে।

দেশভাগের রেশ কাটে নি বাবা।

প্রফুল্ল, ভেবে শেষ করা যায় না। তাছাড়া ভবিষ্যৎ আমরা দেখতে পাই না। এ দেশেরও সব লোকই খারাপ না। আবার পশ্চিমবঙ্গের সব লোকই ভালো নয়। ভালো-মন্দ মিলেই পৃথিবী।

বুঝেছি, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে তোমরা হেরে গেছ। নইলে এমন মুনি-ঋষির মতো কথা বলতে না। যাকগে, সামনে যদি কোনো দাঙ্গা বাধে আমি সেই ভয়েই অস্থির থাকি।

সরোজিনীর মনে হয় অনিমেষ সামনে থাকলে ওর এই কথার একটা উত্তর দিয়ে দিত। এখানে যারা উপস্থিত আছে তারা কেউ কিছু বলে না। বিম্ববতী নারকেলের নাড়ু আনতে ঘরে গেছে। প্রফুল্ল আবার বলে, কে জানে এই চাঁদপুর একদিন নোয়াখালীর মতো ভয়াবহ হবে কিনা! গান্ধী তো বেঁচে নেই যে দাঙ্গার কথা শুনে তিনি ছুটে আসবেন।

এবারও কেউ কথা বলে না। বিম্ববতী এক থালা নারকেলের নাড়ু এনে সামনে রাখে। প্রফুল্ল নাড়ু মুখে পুরতে পুরতে বলে, কতদিন মায়ের হাতের নাড়ু খাই নি। মাগো তুমি আমার সঙ্গে নদীয়ায় চলো।

সরোজিনী ফোঁস করে বলে, নাড়ু আর পিঠেপুলি দিদি আর কত বানাবে! রান্নাঘর থেকে দিদির এখন ছুটি নেওয়া দরকার।

প্রফুল্ল কিছু বলার আগেই বিম্ববতী বলে, কাল দুপুরে ইলিশ মাছের দোপেঁয়াজা খাবি, নাকি পুঁইশাক দিয়ে ইলিশ রাঁধব ?

দোপেঁয়াজা করো মা। মুগের ডাল রাঁধবে। আর বেগুনের দোলমা।

আচ্ছা সব হবে। পাটালি গুড়ের পায়েসও করে দেব।

প্রফুল্ল হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, একটু আগে কাকি বলল, রান্নাঘর থেকে তোমার ছুটি নেওয়া দরকার। আসলে বুঝতে পারছি, আমার এখানে আসা কাকির পছন্দ হয় নি।

সরোজিনী গম্ভীর হয়ে বলে, দিদির শরীর খারাপ। আমি এজন্য বলেছি প্রফুল্ল।

ওই হলো। থাক এসব কথা। মা যে কত পারে তা আমি বুঝে গেছি। মা শোনো, সুনীল আর অনিমেষ যদি লেখাপড়া করতেই চায়, তাহলে ওদেরকে নদীয়ায় নিয়ে ভর্তি করে দেই। ওখানকার স্কুলে পড়ালেখা ভালো হয়।

সরোজিনী সঙ্গে সঙ্গে বলে, অনিমেষ এ বছর ফাইভে বৃত্তি পেয়েছে। ওকে টানা-হেঁচড়া না করাই ভালো। ম্যাট্রিক পাস করুক, তারপর দেখা যাবে।

কাকি মা এ মাটি কামড়েই পড়ে থাকতে চায়।

অমিয়নাথ সঙ্গে সঙ্গে বলে, এ মাটিতেই আছে চৌদ্দ পুরুষের ভিটে। সেজন্য ছাড়তে মন চায় না।

তবে সুনীলের লেখাপড়া নদীয়ায় হলে মন্দ হয় না প্রফুল্ল।

বিম্ববতীর কথায় এতক্ষণে প্রফুল্ল সোজা হয়ে বসে বলে, ঠিক আছে মা, তোমার কথায়ই সব হবে। ওকে তাহলে আমার সঙ্গেই নিয়ে যাব। ওকে তুমি রেডি করে দিয়ো। এখন ঘুমুতে যাই। কাল সূর্য ওঠার আগে মেঘনা নদীর পাড়ে ঘুরতে যাব।

প্রফুল্ল উঠে গেলে বিম্ববতী খুশি মনেই বলে, আমি চাই সুনীল নদীয়ায় গিয়ে লেখাপড়া করুক। প্রফুল্ল ওর বড়ভাই। ও ঠিকই ওকে দেখেশুনে রাখতে পারবে। তুমি কী বলো ?

সুবোধনাথও সায় দেয়। ঘনঘন মাথা নেড়ে বলে, প্রস্তাবটা খারাপ না। ছেলেটি মানুষ হোক এটাই তো চাই। এখানে তো ও পড়াশোনা করতে চায় না। প্রফুল্লর কাছে থাকলে ভয়ে লেখাপড়া করবে বলে আশা করা যায়।

কথা শেষ হতে না হতেই সরোজিনী উঠে পড়ে। রান্নাঘরের দিকে যায়। বিম্ববতী সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সরোজিনী কি মন খারাপ করল ? করতেই পারে। নদীয়ায় থাকতে গেলে প্রফুল্ল তো ওদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিল। একটু পরে উঠে যায় অমিয়নাথ। সুবোধনাথ ও বিম্ববতী পরস্পরের দিকে তাকায়। বিম্ববতী বলে, সুনীলকে প্রফুল্লর সঙ্গে যেতে দেওয়া কি ঠিক হবে ? ও সুনীলকে নিজের ব্যবসায় লাগিয়ে দেবে না তো ? ছেলেটার পড়ালেখা মাথায় উঠবে না তো ? আমাদের তো প্রফুল্লর জন্যই চলে আসতে হয়েছিল ? সে কথাগুলো ভুলি কী করে ? তুমিই ফিরে আসার কথা বলেছিলে। তুমিই ওর ওপর বেশি বিরক্ত হয়েছিলে।

এখন আর এসব ভেবে লাভ নেই সুনীলের মা। যা হওয়ার হয়েছে। এ নিয়ে আর ভেব না। সুনীলকে যেতেই দাও।

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

AMARBOI.COM

ওখানে গিয়ে একটা কিছু করে খাবে।

আর লেখাপড়া ?

জানি না। ভাবব না। ও যদি মনে করে ফিরে আসবে, তবে আসবে। তখন নিজেদের ব্যবসায় লাগিয়ে দেব। এমনিতেই ওর পড়ালেখায় মন নেই। কোনোরকমে টেনেটুনে পাস করে।

বিম্ববতী মৃদুস্বরে বলে, ওকে এখানে রাখতে তুমি কি ভয় পাচ্ছ গো ?

সুবোধনাথ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, মানুষকে অবিশ্বাস করতে নেই। এখানকার স্কুলের শিক্ষকদের তো চৌদ্দ পুরুষের ভিটে এখানে। তারা কেউ যাওয়ার কথা ভাবতেও পারেন না। বলেন, এ মাটিতেই মরণ হোক।

তাহলে আমাদের অবিশ্বাস কেন ?

আমরা এখানে নতুন। এটা আমাদের পৈতৃক ভিটে নয়। কখন আবার এখান থেকে অন্যখানে যেতে হবে, কে জানে। আসলে ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না বলে আমার ভয়।

ঠিক বলেছ। আমারও এমনই লাগে। যেন পাখির বাসায় থাকি।

বিম্ববতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে, পাখির বাসা যেমন ঝড় এল উড়ে যায় আমাদেরটাও তাই। আমরা মানুষের তৈরি বাসায় থাকি। খড়কুটোর তৈরি। যখন-তখন উড়ে যায়।

বিম্ববতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। সেজন্য সুবোধনাথের মানসিক যন্ত্রণার ছাপ মুখে দেখতে পায় না। বিম্ববতী উঠোনের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়। দেখতে পায় সরোজিনী কুয়ো থেকে জল উঠাচ্ছে। কলসিতে জল ভরছে। ওর স্বাস্থ্য ভালো। হাসিমুখে কাজ করে। খুব কমই বিরক্ত হয়। বিয়ের পর থেকেই তো দুজনে একসঙ্গে আছে। কখনো বড় ধরনের মনোমালিন্য হয় নি। ছোটখাটো যা হয়েছে, তা অল্পেই চুকেবুকে গেছে। দু'বোনের মতো দিন কাটাতে পেরে দুজনেই খুশি। বিম্ববতীর মনে হয় প্রফুল্লর কথা মনে করে ও মাঝে মাঝে অন্যরকম হয়ে যায়। তখন সরোজিনীকে বাদ দিয়ে নিজের জন্য কিছু ভাবে। আসলে এটা ঠিক নয়। নিজের কাছে নিজের হেরে যাওয়ার ঘটনাই এমন। আজও তেমন অনুশোচনা ওকে পেয়ে বসে।

রাতে ঘুমুনোর আগে সরোজিনী কুয়োতলায় নিয়ে যায় অনিমেষকে। ও গুনগুন করতে করতে মায়ের পিছু পিছু হেঁটে আসে। বলে, মা তোমাকে জল তুলে দেব ?

না বাবা, জল লাগবে না। লাগলে আমিই তুলব।

তাহলে ডেকেছ কেন ?

তোকে চুপিচুপি একটা কথা বলার জন্য এখানে ডেকেছি।

সবার সামনে বলা যাবে না বুঝি ?

হ্যাঁ তাই। কথাটা তোর আর আমার।

তুমি যা বলবে আমি তা শুনব মা। বলো কী বলবে ?

প্রফুল্ল যে তোকে আর সুনীলকে নদীয়ায় নিয়ে যেতে চায় এটা শুনে আমি ভয় পেয়েছি। তুই কিন্তু যাওয়ার কথা মনেও আনবি না। মনে থাকবে ?

থাকবে মা। একশবার থাকবে। এ নিয়ে তুমি মন খারাপ করবে না একটুও।

নদীয়ায় গিয়ে আমরা কেন ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম, তা তো তোকে আমি বুঝিয়ে বলেছি।

আমি সব জানি মা। আমার চোখের ওপরই তো সবকিছু ঘটেছিল। আমি দাদাকে কী বলেছি তা তো তুমি শুনেছ মা। এখন তোমার কথা শুনে আমার আর ভুল হবে না। আমি এ দেশেই পড়ালেখা করব।

সরোজিনী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দেয়। ওর মনে হয় চারদিক থেকে কলরব উঠেছে। কোথাও অসংখ্য পাখি কিচকিচ করছে। অন্ধকার ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে আসবে পূর্ণিমার শশী। সরোজিনীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়। বুঝতে পারে মানুষ এভাবে খুশির প্রকাশ অনুভব করে। উঠোন পেরিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে অনিমেষ। বারান্দায় ওঠে।

পরদিন সকালে গাঁয়ের এখানে-ওখানে ঘুরে বাড়ি ফিরে প্রফুল্ল বলে, বাবা এখানকার অনেক মানুষই মহাত্মা গান্ধীকে দেখেছে।

হ্যাঁ, তা তো দেখবেই। পার্টিশনের মাত্র এক বছর আগে তিনি নোয়াখালীতে দাঙ্গা থামাতে এলেন। চাঁদপুরের মেঘনা নদীর ঘাট থেকে কলকাতায় গেলেন। সেটাই ছিল পূর্ববঙ্গ থেকে তার শেষ যাত্রা। তখন আমরা চাঁদপুরে থাকলে আমরাও তাঁকে দেখতে পেতাম।

বিম্ববতীও উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, আমি আর সরোজও তাঁকে দেখতে প্রার্থনা সভায় যেতাম। চাঁদপুরের অনেক নারীরা সেই সভায় গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান সবাই। ওদের অনেক গল্প আছে।

রণবী সাহা আমাকে বলেছে, যাবার আগে মহাত্মা বলেছিলেন, নোয়াখালীতে দাঙ্গার ভয়াবহ রূপ আমি দেখেছি। আমি আবার নোয়াখালীতে আসব।

অমিয়নাথ বিড়বিড় করে বলে, তিনি আর কোনোদিন আসবেন না।

আমি তো এই দাঙ্গাকে ভয় পাই কাকু।

এখন আর ভয়ের কোনো কথা নেই। যা হবার হবে।

অকস্মাৎ নীরবতা নেমে আসে। এখানকার মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত নোয়াখালীর দাঙ্গার গল্প ঘরের স্তব্ধতা ঘনীভূত করে। কেউ কোনো কথা বলে না। দোলা প্রশ্ন করে, দাঙ্গা কী মা ?

কারও মুখে কথা নেই। ওকে কি বলা যাবে মানুষের হাতে মানুষের মরণই দাঙ্গা ? পুরুষের হাতে নারীর শারীরিক নির্যাতন দাঙ্গা ? বাড়িঘর লুট হওয়া দাঙ্গা ? বাড়িঘর জ্বলে ওঠা আগুন দাঙ্গা ? ও কী বুঝবে ? ওর তো বোঝার বয়সই হয় নি। ওকে কি বোঝানো যাবে যে মহাত্মা গান্ধীর মতো মানুষকে ছুটে আসতে হয় দাঙ্গাপীড়িত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ? উন্মত্ত মানুষকে নিরস্ত করার জন্য তাঁকে সাতচল্লিশটি গ্রামে ঘুরতে হয়েছিল। কী কঠিন কাজ ছিল তা। সঙ্গে ছিল বেশ কয়েকজন মানুষ। তারা দিনরাত পরিশ্রম করেছে। এসব না বুঝলে দাঙ্গা বোঝা যায় না।

এবার শীলা জিজ্ঞেস করে, বাবা দাঙ্গা কী ?

দাঙ্গা! দাঙ্গা! আমি জানি না দাঙ্গা কী! ভয়ে চুপসে যায় অমিয়নাথের মুখ। শীলা আর দোলা হাঁ করে বাবাকে দেখে। কেমন অচেনা হয়ে গেছে বাবার মুখ। তাহলে দাঙ্গা কি এতই খারাপ! দু'বোনে সবার মুখের দিকে তাকায়। দেখতে পায় সবাই কেমন ভয়ে কুঁকড়ে গেছে, যেন একটা কিছু এখনই ঘটবে। একসঙ্গে কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধ সময় পার হয়ে যায় বসে থাকা মানুষগুলোর ওপর দিয়ে।

সাত দিন পর প্রফুল্ল সুনীলকে নিয়ে রওনা হয়। সুনীল বেশ আগ্রহভরে দাদার সঙ্গে যায়। অনিমেষকে বলে, তুই গেলে মজা হতো রে। নতুন জায়গায় বন্ধু হতে সময় লাগবে। আমি আবার সহজে বন্ধুত্ব করতে পারি না। অনিমেষ মৃদুস্বরে বলে, সবই পারবে দাদা। তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক বলেছিস। সবই পারব। সুনীল উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে। নদীর ঘাটে দাঁড়িয়ে বাড়ির সবাই দুজনকে বিদায় দেয়। মুখে দাঁড় টানার ধ্বনি তুলে মাঝিরা নৌকা ছেড়ে দেয়। নদীর জলে বড় নৌকার ধাক্কায় ঢেউ ফুলে উঠে ভেঙে যায়। বিম্ববতী কাঁদতে কাঁদতে বলে, ছেলেটাকে যেতে দিয়ে ভুলই করলাম। মনে বড় টান লেগেছে সরোজ। সরোজিনী তার দু'হাত ধরে বলে, ভগবান যা করে, ভালোর জন্যই করে। ঘরে চলো দিদি। ও লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে ফিরলে আমাদেরই গর্ব হবে।

বিম্ববতী চোখের জল মুছে বলে, ফিরবে তো ?

ফিরবে ফিরবে বাবা-মায়ের টান আছে না।

বিম্ববতীর কণ্ঠস্বরে দ্বিধা ধ্বনিত হয়।

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

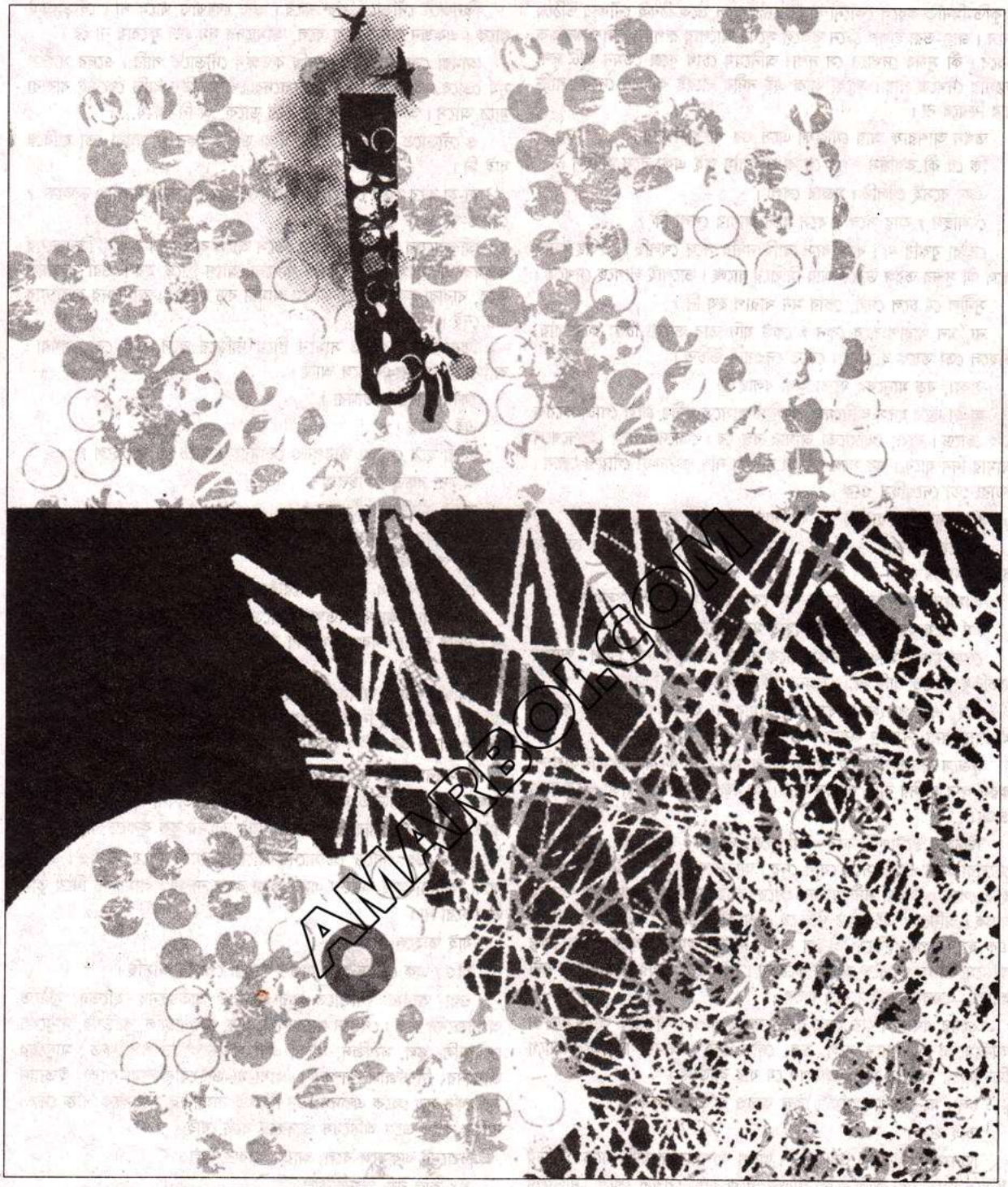

বলে, ভয় একটাই। আমরা ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না।

সরোজিনী বিনা দ্বিধায় বলে, ওটাইতো রহস্য। ওই রহস্য না থাকলে জীবন কত সহজ হয়ে যেত দিদি!

সবাই বাড়ি ফিরে যায়। নদীর ঘাটে একা বসে থাকে অনিমেষ। ওর মন খারাপ। প্রফুল্ল কেন সুনীলকে নিয়ে গেল এটা ওর মাথায় ঢোকে না। নদীয়ায় লেখাপড়া আছে, এখানে নেই ? ও ছোট ছোট ঢিল ছুড়ে মারে নদীর জলে। জলে বুড়বুড়ি ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়। মনে হয় কী সুন্দর দৃশ্য! দেখতে ভালেই লাগে। মেঘনা একটি দারুণ নদী। নামটাও খুব সুন্দর। কে এই নামটি রেখেছিল ? এখন আর জানার কোনো উপায় নেই। ও ঠিক করে, কাল ও জেলেদের সঙ্গে ইলিশ মাছ ধরতে যাবে।

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

AMARBOI.COM

কাকুতি-মিনতি করলে কোনো না কোনো জেলে ওকে ঠিকই নৌকায় উঠিয়ে নেবে। জাল-ভরা ইলিশ টেনে তুললে সূর্যের আলোয় রুপালি ইলিশ ঝকঝক করবে। কী সুন্দর দেখাবে সে দৃশ্য! অনিমেষ চোখ বুজে তেমন এটি দৃশ্য কল্পনায় দেখতে পায়। ভাবে, আজ এই নদীর ধারেই কাটিয়ে দেবে। বাড়ি আর ফিরবে না।

তখন আশরাফ আর মোস্তফা এসে ওর পাশে দাঁড়ায়।

কি রে কী করছিস ? দূর থেকে দেখলাম তুই একা বসে আছিস।

একা বসেই খেলছি। মজার খেলা।

খেলছিস ? কার সঙ্গে ? বসে বসে আবার খেলা কি ?

তোরা বুঝবি না। বসে বসে আমি নদীর সঙ্গে খেলছি। দেখছি নদীর জলে কী সুন্দর তরঙ্গ উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। ভালোই লাগছে দেখতে।

সুনীল যে চলে গেল, তোর মন খারাপ হয় নি ?

না, মন খারাপ হবে কেন ? কেউ যদি তার ভালো চিন্তা করে যায়, তাহলে তো তাকে হাসিমুখে যেতে দেওয়াই উচিত।

বাব্বা, বড় মানুষের মতো কথা বলছিস।

হা-হা করে হাসে অনিমেষ। হাসতে হাসতে নদীর জলে গোটা কয়েক ঢিল ছোড়ে। বলে, তোরাতো আমার বন্ধু রে। তোদের সঙ্গে হেসেখেলে আমার দিন যাবে। ওর সঙ্গে আমার বনতো না। ও একটা গোঁয়ার ছেলে। তোরা তো দেখেছিস ওকে।

হ্যাঁ, দেখেছি। রাগ উঠলে ওর মাথায় কিছু থাকত না।

অনিমেষ আবার হেসে বলে, জেদ আর গোয়ার্তুমী ছাড়া। তোদের সঙ্গেই আমার বেশি বনে।

আমাদের সঙ্গে তোর বেশি বনে কেন ? আমার তো মুসলমান।

ধর্ম দিয়ে বন্ধুত্ব হয় নাকি! বন্ধুত্ব মনের টান রে।

তোর মাথায় মধ্যে এতকিছু থাকে বলেই তো তুই ফার্স্ট হোস। আমরা এতকিছু বুঝতে পারি না। সেজন্য তুই আমাদের মধ্যে সেরা।

যাহ, এত প্রশংসা করিস না! আমার মা শুনলে তোদেরকে পায়েস খাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করবে।

দুজনে হাততালি দিয়ে বলতে থাকে, কী মজা, কী মজা, তোর প্রশংসা করব আর মাসির রান্না পায়েস খাব। কী মজা, কী মজা—রাজা খাবে ব্যাঙ ভাজা!

তিনজন হুটোপুটি করে। মাঠজুড়ে দৌড়ায়। আশপাশ থেকে অন্য ছেলেরা এসে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়। অনিমেষ ভাবে, মাঠটা অনেক বড় হয়ে গেছে। মেঘনা নদী যতদূর গেছে, আজ মাঠটা ওদের নিয়ে ততদূর যাচ্ছে। অনিমেষ এই মাঠে দাঁড়িয়ে এভাবেই বড় হয়, এভাবে মিলেমিশে এক হয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামে, দিনের আলো কমতে থাকে কিন্তু অনিমেষের চোখ থেকে আলো কমে না। এই মাঠে সূর্যের শেষ আলো নদী হয়েছে—মেঘনার মতো বয়ে যাচ্ছে।

ওদের এখন যে যার মতো বাড়ি ফেরার পালা। আশরাফ আর মোস্তফা অনিমেষের হাত ধরে বলে, চল, দৌড় দেই। আমরা তিনজনে আগে তিনজনের বাড়িতে যাব। তারপর যে যার বাড়িতে।

চল। মনে রাখিস আমরা কিন্তু কারও বাড়িতে ঢুকব না।

তাই হবে।

তিনজনে দৌড়াতে শুরু করে। আগে আশরাফের বাড়ি পড়ে। বাড়ির সামনে গিয়ে ওরা অনিমেষের বাড়ির দিকে যায়, সেখান থেকে মোস্তফার বাড়িতে। শেষ বাড়ির সামনে এল অনিমেষ বলে, চল আমরা আবার নদীর দিকে যাই। আমরা নদীর পাড় দিয়ে দৌড়াব।

কতদূর যাব ?

যতদূর গেলে আমাদের দম ফুরাবে না অতদূর।

বেশ, তবে তাই হোক।

তিনজনে দৌড়াতে শুরু করে। ওরা কোথাও থামে না। দৌড়াতেই থাকে। একজন অন্যজনকে বলে, আমাদের দম তো ফুরোয় না রে।

আমরা তো থামব না। দেখি কতক্ষণ দৌড়াতে পারি। ওদের সামনে সূর্য ডোবে। অন্ধকার নামে। ছেলেদের খোঁজে তিন বাড়ি থেকেই বাবারা মাঠে আসে। অমিয়নাথ চিৎকার করে ডাকে, অ-নি-মে-ষ...।

ও দৌড়াতে দৌড়াতে বলে, বাবা ডাকছ কেন ? আমরা তো হারিয়ে যাই নি।

হা-হা করে হাসে মোস্তফা। বলে, ওই শোন আমার আব্বাও ডাকছে ? মো-স্ত-ফা...।

আশরাফের আব্বার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে বাতাসে। কখনো তিনজনের কণ্ঠস্বর একসঙ্গে শোনা যায়। কখনো আগে-পিছে হয়। ওরা বলাবলি করে, বাবারা বুঝতে পারে না যে আমরা বড় হয়েছি। আমাদের হারানোর ভয় নেই।

তিনজনই বাবাদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, এই তো আমরা। আমরা তিনজনে একসঙ্গে আছি।

কোথায় ছিলে তোমরা ?

এই মাঠেই।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তারপরও তোমরা এ মাঠে কী করছিলে ?

আমরা বন্ধুত্ব করছিলাম।

বন্ধুত্ব করছিলে! কীভাবে ?

আমাদের দম দিয়ে। আমরা ঠিক করেছিলাম, যতক্ষণ দম থাকবে, ততক্ষণ আমাদের বন্ধুত্ব থাকবে।

তোমরা কি দম রাখতে পেরেছিলে ?

হ্যাঁ বাবা। আমরা যতক্ষণ দৌড়েছি, ততক্ষণ আমাদের দম ফুরোয় নি। নদীর বাতাস বরং আমাদের দম বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা খুব মজা করেছি।

মোস্তফার বাবা অমিয়নাথের হাত ধরে বলে, ভালোই হয়েছে। আমাদের ছেলেরা এমন বন্ধুত্ব নিয়ে বড় হতে পারলে আর খারাপ পথে যাবে না। পথ ভুল হওয়ারও ভয় নেই। ভালোই হয়েছে। চলো বাবারা, বাড়ি চলো।

অমিয়নাথ ছেলের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, ভবিষ্যতে এমন বন্ধুত্বের খেলা খেললে বাড়িতে বলে এসো। আমাদের ভাবনা হয়, তোমরা বোঝ না ? তোমাদের মায়েরা ভয় পেয়ে যায়। তাদের বুক কুঁকড়ে যায়।

এখন এক দৌড়ে তোমাদের মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। তাকে বলো, আমরা আর কখনো এমন কাজ করব না মা। আমাদের নিয়ে তুমি ভয় করো না।

যাই তাহলে ?

যাও। এক দৌড়ে চলে যাও। আমরা পেছনে আসছি।

ওরা আবার দৌড়াতে শুরু করে। একজনের হাতের মুঠিতে অপরজনের হাত। পেছনে থাকে নদী, মাঠ, গাছগাছালি, বাড়িঘর, মানুষের গেরস্থালি, স্কুল, মসজিদ, মন্দির এবং সবচেয়ে বড় শস্যক্ষেত। মানুষের জীবনের নির্ভেজাল সম্পর্ক। বাবা-মা-ভাইবোন-মামা-কাকা ইত্যাদি সম্পর্কের সূত্র থেকে একদম ভিন্ন। বন্ধুত্ব সামাজিক সম্পর্ককে শক্তি দেয়। বাড়ির কাছে এসে অনিমেষ ওদেরকে বলে, যাই।

দুজনেই একসঙ্গে বলে, আয়। আবার কাল।

শুধু কাল নয়, অনেককাল।

অনিমেষ বলতে থাকে, অনেককাল অনেককাল। আমাদের সামনে অনেককাল। ও একমুহূর্ত চুপ করে ভাবে, আমরা কতদিন বাঁচব ? দেখতে পায় আশরাফ আর মোস্তফা বাড়িঘরের আড়ালে চলে গেছে। দুজনকে আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা যে পথে গেছে সে পথে ওদেরকে আর

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

এখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে না। হেঁইও-হেঁইও ? মারো ঠেলা হেঁইও বলতে বলতে ও ছুটে যায় কুয়োতলায়। মায়ের সামনে দাঁড়ানোর আগে মাঠের ধুলো ধুয়ে ফেলতে হবে। শরীরে ধুলো থাকলে মা ওকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ পাবে না। ও এক বালতি জল তুলে চোখে-মুখে ছিটায়। হাত-পা ধুতে থাকে। শুনতে পায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা ওকে ডাকছে। ও ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আসছি মা। ওর কাছে মায়ের কণ্ঠ ঘুঘু পাখির ডাকের মতো মনে হয়। কী সুন্দর ডাক! মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে। মা-ই বুঝি এখন একটা ঘুঘু পাখি।

দুই

এখানে আসার পরে বছর দুয়েক গড়িয়ে গেল। সুবোধনাথ-অমিয়নাথের বাড়ির পাশের খালি জায়গায় অনেকে বাড়িঘর তুলে বসবাস শুরু করেছে। এলাকা জমজমাট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে খানিকটা ঘিঞ্জিও হয়েছে। আগের মতো খোলামেলা অবস্থা নেই। ঠিকমতো রোদ-বাতাস পাওয়া যায় না। মানুষের কথাবার্তা লেগেই থাকে। কখনো ঝগড়াঝাটি, চেঁচামেচি হয়। শান্তিপ্রিয় সুবোধনাথের এসব ভালো লাগে না। মন খারাপ করে। কখনো রাত জেগে বসে থাকে। ভাবে, এভাবেই আর একটি দাঙ্গার ঘটনা ঘটবে ? এভাবেই ঠিক হবে রাজনীতির ধারা ? কেমন গা-ছমছম করা অনুভূতি ওকে আন্দোলিত করে। ও স্বপ্নে-জাগরণে মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবে। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় তিনি নোয়াখালী এসে বলেছিলেন, আমি এখন থেকে কিছু সময়ের জন্য বাঙালি, এখন থেকে আমি নোয়াখালীরই একজন। দাঙ্গার সময় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছিলেন, প্রার্থনা-সভা করেছিলেন, অসংখ্য মানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, অহিংস বাণী প্রচার করেছিলেন আর শান্তির পক্ষে কাজ করেছিলেন। এখন কিছু হলে কে তাদের পাশে দাঁড়াবে ? সুবোধনাথের এসব কথায় অস্থির হয়ে যায় অমিয়নাথ। দাদাকে শান্ত রাখার জন্য বলে, এসব ভেবে শরীর খারাপ করো না দাদা। ভেবে দেখ কতটা সময় পার হয়ে গেল। লোকসংখ্যা বাড়ছে। তাই ঘরবাড়িও বাড়ছে। যাদের জায়গাজমি নেই তারা পড়ে থাকা জমিতে ঘর তুলছে। এখানে তোমার-আমার কিছু করার নেই।

সুবোধনাথ ঘাড় নাড়ে। তার বয়স হয়েছে। সব চুল সাদা হয়ে গেছ। শরীর ভেঙেছে। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে। এখন আর নতুন করে কী করার আছে তার ?

অমিয়নাথ ভাইকে উজ্জীবিত করার জন্য বলে, দাদা আমার অনিমেষ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। হারাণের বয়স হয়েছে। ওর জন্য কনে দেখতে হবে। দোলা-শীলাও তো বড় হয়েছে। ওদের মা বলেছে ওদের জন্যও ছেলে দেখতে।

শীলা-দোলার বিয়ে ? না, না, এখনই নয়। ওরা বেশ ছোট। আমি আবার এত অল্প বয়সে বিয়ের পক্ষে নই।

অমিয়নাথ দাদার কথায় সায় দেয় না। ঘনঘন মাথা নেড়ে বলে, বিয়ে তো দিতেই হবে। অপেক্ষা করে লাভ কি ?

সুবোধনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আগে হারাণের জন্য মেয়ে দেখো। ওর বিয়ে আগে হয়ে যাক। ওর থাকার জন্য একটা ঘর তুলতে হবে। আর মেয়েরা পড়ালেখা করছে করুক। ম্যাট্রিকটা পাস করলে স্কুলের টিচার কিংবা নার্সের কাজ করে খেতে পারবে। মেয়েদেরও একটা অবলম্বন থাকা দরকার। ভগবান না করুক, স্বামীর একটা কিছু হয়ে গেলে মেয়েরা জলে ডোবে।

ঠিক বলেছ দাদা। অমিয়নাথ ভাইয়ের কথায় সায় দেয়। তোমার কথামতোই কাজ করব।

রাতে খাওয়াদাওয়া শেষ হলে হারাণকে বসিয়ে বিয়ের কথা তুলতেই ও ছিটকে ওঠে। বলে, অসম্ভব এখন কোনো বিয়ে নয়। আমি মোটেই বিয়েতে রাজি নই।

বড়রা সবাই অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সুবোধনাথ বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে, তোর দেখছি গুরুজন জ্ঞান নেই। আমাদের মুখের ওপর তুই এইভাবে কথা বললি ? তোর এত সাহস!

ক্ষমা করবেন জেঠু। আমার সাহস নেই। নিজের অক্ষমতার জন্য আপত্তি করেছি।

তোর আবার অক্ষমতা কি ?

নিজের ব্যবসাই তো দাঁড় করাতে পারি নি।

আমাদের ব্যবসা, তোর না ?

আমি মনে করি বাবা-জ্যাঠার ব্যবসার পাশাপাশি নিজেরও কিছু করা দরকার। নিজের রোজগার না থাকলে কেমন অসহায় লাগে। তাছাড়া সুনীল নদীয়ায় গেলেও আমরা সবাই মিলে পাঁচ ভাই। আমি জানি সময়তো প্রফুল্ল দাদা ভাগের টাকা নিতে ঠিকই আসবে। মনে নেই জেঠু, প্রফুল্ল দাদা কীভাবে আমাদের আলাদা করে দিয়েছিল। বাবা কত কষ্ট পেয়েছিল। আপনিও পেয়েছিলেন। আপনি তো মানতেই পারেন নি। সেজন্য সবাইকে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

এসব কথা এখন থাক হারাণ। পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই।

অমিয়নাথ ছেলেকে মৃদু ধমক দিলে হারাণ উঠে চলে যায়। ওর পিছে পিছে সুখেনও যায়। বসে থাকে অনিমেষ আর শীলা-দোলা। এই মুহূর্তে ওদের খুনসুটি বন্ধ থাকে।

তখন সুবোধনাথ বলে, ঠিক আছে, ও যা চায়, তাই হবে। দু'এক বছর যাক। দেখি ও নিজে কী করতে পারে। ও খারাপ চিন্তা করে নি।

বিন্ধবতী সায় দিয়ে বলে, ও যা বলেছে আমার মনে হয় ঠিকই বলেছে। আরও দু'এক বছর যাক। ওর জন্য একটা নতুন ঘর তুলে আমরাও তৈরি হই।

সরোজিনীও এই কথায় সায় দেয়। তারপর বলে, আমি অমলেশ মাস্টারের মেয়েটাকে মনে মনে পছন্দ করেছি।

থাক এ নিয়ে আর কথা বলার দরকার নেই। ছেলে যাকে পছন্দ করবে, তাকেই আমাদের মানতে হবে।

এটাই ভালো। তাতে আমাদের দায় কমবে। নিজেদের পছন্দের মেয়ে ছেলেটার ওপর চাপানো হবে না।

ভেঙে যায় রাতের আসর।

অনিমেষ বলে, মা আমি এখন পড়তে বসব। হারিকেন আমি নিয়ে গেলাম।

পড়া শেষ হলে হারিকেন নিভিয়ে দিস বাবা। ভুলে যাস না কিন্তু।

না, মোটেও ভুলব না। তুমি কিন্তু ভোর রাতে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো।

তা তো দিতেই হবে। নইলে স্কুলের হেডমাস্টার বেত নিয়ে এসে তোকে তুলবে।

বাব্বা, স্যার পারেও। কেমন করে পারে মা ? পরীক্ষার পড়া শেষ করার জন্য রাতের বেলা গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় স্যার।

অমিয়নাথ ঘরে ঢুকতে গিয়ে ফিরে এসে বলে, ওয়ালি মাস্টারের মতো হেডমাস্টার আমি দেওভোগে দেখি নি। ছেলেপেলেদের পড়ালেখার জন্য একজন মানুষ বেত নিয়ে রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় ? এটা আমাকে অবাক করে হারাণের মা।

আমিও অবাক হই। কেমন করে যে পারে তা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি না। অনিমেষ যদি মার খায় এই ভয়ে আমার তো ঘুম আসে না। একটু পরপর ঘুম ভেঙে যায়। আর মনে হয়, অনিমেষকে উঠিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে।

সরোজিনী ছেলের হাতে হারিকেন দিতে দিতে বলে, সময়মতো ঘুমিয়ে পড়িস বাবা।

তুমি আমাকে ঠিকমতো তুলতে পারবে তো মা ?

পারব পারব, ঘাবড়াস না।

সরোজিনী নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। রাত হয়েছে। ঘুম পাচ্ছে। শামকুকড়া ডাকছে একটানা—এটা রাতের

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

AMARBOI.COM

পাখি। রাতেই ডাকে। হঠাৎ উঠোনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে অনেকদিন কাঁদে নি। তাহলে ওদের কি কান্নার দিন ফুরিয়ে গেছে ? এখন ওরা অনাবিল শান্তিতে বাস করবে ? ছেলেমেয়েরা হেসেখেলে বড় হবে ? বোধহয় এখন তেমনই সময়। আর কোনো দাঙ্গা বাধবে না। হানাহানি হবে না। মানুষকে মানুষ মেরেকেটে সাফ করবে না। এখন স্কুলের শিক্ষক যত্ন নিয়ে ওদের পড়ালেখা শেখাবে। ছেলেমেয়েরা বড় বড় জায়গায় চাকরি করবে। বেশ তো, এমনই হওয়া উচিত। ওদের সামনে তেমন দিনই থাকুক। ভরে উঠুক রাত। ভরে উঠুক দিন। হঠাৎ সরোজিনীর মনে হয় শীলা-দোলাকে বিয়ে দেবে কেন ? ওদেরকে লেখাপড়া শেখাবে। ওরা স্কুলের টিচার হবে। ভাবতেই সরোজিনী খুশি হয়ে ওঠে। নিজে নিজে সাহসী হয়। স্বপ্ন দেখে। আশা নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। মেয়েদের বিয়ে দিলে তো দূরে যাওয়ার রাস্তা ওদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। ওরা দূরে কোথাও যেতে পারবে না। নিজেদের জীবন নিজেদের মতো করে গোছাতে পারবে না। লেখাপড়া শেখালে ওরা নিজেদের মতো করে ভাববে, দূরে যাবার সুযোগ পাবে। অন্তত হাঁড়িকুড়ির মধ্যে বন্দি থাকবে না।

সরোজিনী নিজের এ ভাবনায় নড়েচড়ে ওঠে। ভেতরে এক ঝাপটা শিউলি ফুলের গন্ধ ঢোকে। ভাবে, নিজের ভাবনার কথা স্বামীকে বলবে। পরমুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, যদি অমিয়নাথ বিষয়টি না মানতে চায় তাহলে ? যদি বলে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে না দিলে পরে আর বিয়ে হবে না, তখন ? তারচেয়ে ওর ভাবনা ওর কাছেই থাকুক। সময়েই দেখবে যে কী করা যায়। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে সারা দিনের ক্লান্তি এসে ভর করে। শুয়ে পড়ার অল্প সময়েই ঘুমিয়ে পড়ে সরোজিনী।

অনিমেষের হারিকেনের চারপাশে পোকা জমেছে। কিছু কিছু পোকা চিমনি ঘিরে বসেছে। কতগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। পড়তে বসার পরে এই উৎপাতে ওর বিরক্তি লাগছে। অঙ্ক করতে মনোযোগ থাকছে না। বাংলা ইংরেজি বা ভূগোল-ইতিহাস পড়তেও বাধা পাচ্ছে। তালের পাখা দিয়ে কিছুক্ষণ পোকা তাড়ায়। পরে ভাবে শুয়ে পড়বে। পড়তে না পারলে এই ঝামেলা করে লাভ কি! কিন্তু ভয় হেডস্যারকে। যারা ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী হেডস্যার তাদের পড়াশোনা স্কুলের সময়ের বাইরেও দেখাশোনা করেন। যে যে বিষয়ে দুর্বল তাকে সে বিষয়টি আলাদা করে পড়ানো হয়। রাতে পরীক্ষার্থীরা যেন ঠিকমতো পড়াশোনা করে সেটাও তিনি মধ্যরাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখেন। বিরক্তিতে ঘুম পায় অনিমেষের। টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে ও। হারিকেনের চিমনি কালো হয়ে টিমটিম করে জ্বলছে। তেল ফুরিয়ে আসছে বলে নিভুনিভু হয়ে এসেছে। সরোজিনীর ঘুম ভেঙে যায়। ভাবে, অনিমেষকে ডেকে দেওয়ার সময় হয়েছে বোধহয়। ও তড়িঘড়ি করে ছেলের কাছে এসে ওকে ডাকে।

বাবা, ওঠ। শেষ রাতে তোকে উঠিয়ে দিতে বলেছিলি।

কয়টা বাজে মা ?

আমি তো ঘড়ি দেখি নি বাবা। তোর টেবিল ঘড়িটা দেখ তো ?

হারিকেনের কাছে এনে টেবিল ঘড়িতে সময় দেখে মেজাজ গরম হয়ে যায় অনিমেষের। চিৎকার করে মাকে বলে, মাত্র একটা বাজে। কেন তুমি আমাকে ডেকেছ ? এখন আমার মাথা ধরবে। পড়ায় মন বসবে না। বইখাতা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করবে। আমাকে এমন অসময়ে ডেকে কাজটা তুমি মোটেই ঠিক করো নি মা।

আহ বাবা চেঁচামেচি করিস না। থাম, থাম। আমার ভুল হয়ে গেছে।

তুমি আমার ঘুমও নষ্ট করলে। বাকি রাত আমার আর পড়া হবে না। আর কখনো ঘড়ি না দেখে আমাকে ডাকবে না।

ঠিক আছে, এরপর থেকে ঘড়ি দেখে তোকে ডাকব। তুই আর চেঁচাস না। তোর বাবার ঘুম ভেঙে যাবে। এমন রাতে চেঁচালে বাইরের লোকেও শুনতে পাবে।

শুনুক গে। যার খুশি সে শুনুক। আমার কি তাতে!

রাগে ফুঁসতে থাকে ও। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থকে সরোজিনী। কী করবে বুঝতে পারে না। অনুশোচনায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

তখন দরজায় খটখট শব্দ হয়। সরোজিনী বুঝতে পারে বেতের বাড়ির শব্দ। বোধহয় হেডমাস্টার তার ছেলের চিৎকার শুনতে পেয়েছে। সরোজিনী দরজা খোলে।

হেডমাস্টার রাগত স্বরে বলে, বানরটা কোথায় ?

অনিমেষ এগিয়ে আসতেই খপ করে চুলের মুঠি ধরে বলে, মায়ের সঙ্গে এভাবে রাগারাগি করতে হয় ? এভাবে কথা বলতে হয় ? আমি তো তোর পড়ালেখার খোঁজ নিতেই এদিকে এসেছিলাম। দূর থেকেই তোর চেঁচামেচি শুনেছি। আর একদিন মায়ের সঙ্গে এভাবে কথা বললে আমি তোকে আস্ত রাখব না।

বলেই পিঠের ওপর দু'চার ঘা বেতের বাড়ি দিয়ে দেয়। সরোজিনী দু'হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলে, মাস্টারসাহেব ও আর এমন করবে না। আজ যে ওর কী হলো! নইলে তো ও আমার শান্ত ছেলে।

মনে থাকে যেন ওর। আমি শুধু লেখাপড়া শেখাই না, আমাকে অনেক কিছু শেখাতে হয়।

চলে যায় হেডমাস্টার। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে অনিমেষ। বাইরে বেলগাছে পেঁচা ডাকে। সরোজিনী নিজেও দু'হাতে চোখের জল মোছে। কুপির আলোয় চামচে করে সরষের তেল গরম করে। অনিমেষের জামা খুলে পিঠে তেল লাগিয়ে দেয়। বেতের বাড়িতে পিঠ লাল হয়ে আছে। ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে, ঘুমিয়ে পড়।

ঘুম আসবে না মা। শরীরে অসহ্য ব্যথা। মাগো ?

অনিমেষ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

ওরে মানিক আমার।

সরোজিনী নিজেও কেঁদে ওঠে। অমিয়নাথ উঠে আসে। অন্য ছেলেমেয়েরাও জেগে ওঠে। অমিয়নাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে ?

সরোজিনী কাঁদতে কাঁদতে বলে, হেডমাস্টার মশায় বলে গেছেন, গুরুজনের সঙ্গে ভক্তি নিয়ে কথা বলতে হয়।

তিনি কখন এসেছিলেন ? তিনি তো ঠিকই বলেছেন। তিনি তো ছেলেমেয়েদের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাতে ঘুরে বেড়ান।

সরোজিনী বলে, দোষটা আমারও হয়েছিল। তিনি অনিমেষের চেঁচামেচি শুনে ঢুকেছিলেন।

থাক, এসব কথা। কাল ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। যাও, সবাই ঘুমুতে যাও। ওর কাছে কারও থাকতে হবে না। ও যে অন্যায় করেছে তার শাস্তিও পেয়েছে। ওকে বুঝতে দাও অন্যায়টা কী, যেন আর কোনোদিন না করে। এটাও বড় শিক্ষা।

তুমি তো দেখছি এক কঠিন বাবা।

ঘুমুতে যাও। আর রাত জেগো না। আমরাও বাবা-মায়ের কাছ থেকে এমন শিক্ষা পেয়েছি। দেখো নি নদীয়ায় প্রফুল্ল যখন আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছিল তখন দাদা তা মেনে নেয় নি। আমাদের নিয়ে চলে এসেছিলেন। আমি তো জানি সেই থেকে তাঁর মনে কোনো শান্তি নেই। কিন্তু একদিনও মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। তাঁর প্রতিবাদও এমন কঠিন ছিল। এসো, ঘুমুবে।

আমি অনিমেষের কাছে থাকি ?

না, দরকার নেই। ও ঘুমিয়ে পড়বে। এসো।

যতক্ষণ ওর ঘুম না আসে ততক্ষণ থাকি ?

ঠিক আছে, থাকো।

অমিয়নাথ কথা না বাড়িয়ে চলে যায়।

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

AMARBOI.COM

সরোজিনী ভাবে, ছেলের কাছে থাকবে তার জন্যও অনুমতি নিতে হবে। কেন ? বুকের ভেতরে প্রচণ্ড রাগ জমে। স্বামী হয়েছে তো কী হয়েছে ? সংসার কি ওর একার ? নাকি ছেলে ওর একার ?

অনিমেষের কান্না কমে এসেছে। ও মৃদুস্বরে বলে, মা জল খাব।

সরোজিনী ছেলের জন্য জল আনে। ওর মাথার নিচে হাত দিয়ে মাথা সোজা করে জল খাইয়ে দেয়। তখন অমিয়নাথের ওপর আবার রাগ বাড়ে সরোজিনীর। চলে গেলে এখন ছেলেকে জল খাওয়াতো কে ? ও কি জল তেষ্টায় বুকের ছাতি ফাটিয়ে ফেলত ? অনিমেষের পড়তে বসার চেয়ারটা এনে সরোজিনী ওর বিছানার পাশে বসে। অনিমেষ মায়ের হাত টেনে ধরে বলে, এখন থেকে আমি গুরুজনদের মান্য করে কথা বলব মা। আমার আর ভুল হবে না।

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

ওরে মানিক, আমি চাই তুই মাস্টারমশায়ের ভালোবাসা যেন পাস। তাহলে অনেক বড় হবি।

মাগো, তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো।

অনিমেষের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। ভিজে যায় বালিশ। বুজে আসে চোখের পাতা।

ভোরে গরম ভাত রান্না করে খেতে দেয় অনিমেষকে। ওর জন্য আজ আর থালায় পান্তা তোলে না সরোজিনী। বলে, আজ স্কুলে যেতে হবে না বাবা। রাতে ঠিকমতো ঘুমুতে পারিস নি। এখন শুয়ে থাক। ব্যথা কমেছে?

কমেছে মা। পুরো যায় নি।

তোর বাবা তো তোকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।

না, না ডাক্তার লাগবে না। এমনি এমনি ঠিক হয়ে যাবে।

তাহলে শুয়ে থাক।

আচ্ছা। অনিমেষ সুবোধ বালকের মতো বিছানায় এসে বসে। আজ ওর বের হওয়ার ইচ্ছা নেই। কারও সামনে পড়তে চায় না। লজ্জা লাগছে। ও জানতে পেরেছে আশপাশের ঘরের সবাই রাতের ঘটনাটা জানে। কেউই হেডমাস্টারের ভয়ে বের হয় নি। বেশি লজ্জা লাগছে মাধুরীলতার জন্য। গতকালই ও বলেছিল, অনিমেষ গাঁয়ের সবাই তোমাকে খুব ভালোবাসে। তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া করো। তোমার কাছে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। অনেকেই তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়।

অনিমেষ খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে বলেছিল, তুমিও চাও মাধুরীলতা?

চাই তো। করবে বন্ধুত্ব?

করব। আমার খুব ইচ্ছা যে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি।

সত্যি! উহ্, কী যে ভালো লাগল।

কথা বলতে বলতে মাধুরীলতা বেণিতে গাঁথা ছোট সাদা ফুলটি খুলে অনিমেষের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, নাও, এটা আমাদের বন্ধুত্বের ফুল। এই ফুলের দিকে তাকালেই তোমার কথা মনে হবে আমার।

অনিমেষ ফুলটা মাধুরীলতার হাত থেকে নিতে নিতে বলেছিল, তোমার কথা আমারও মনে হবে মাধুরী। আমি আমাদের বন্ধুত্বের ফুলগাছ থেকে ছিঁড়ব না।

ইস কী আনন্দ। জীবনভর মনে থাকবে আমার একজন বন্ধু আছে।

বুড়ো হলেও থাকবে?

হ্যাঁ, থাকবে তো। আমি যেখানেই যাই না কেন এই গাঁকে তো কোনোদিন ভুলব না। তেমন তোমাকেও আমার মনে থাকবে। আমাকে তোমার মনে থাকবে না?

থাকবে। থাকতেই হবে। বন্ধুত্বের কথা মনে রেখে আমি আনন্দে থাকব। এই ফুলের গন্ধ আমার বুক ভরিয়ে রাখবে।

কিন্তু আমাদের বন্ধুত্বের কথা কাউকে বলো না। লোকে খারাপ ভাববে। কিন্তু আমরা তো খারাপ নই অনিমেষে।

আমরা তো মোটেই খারাপ নই। তাহলে লোকে খারাপ বলবে কেন?

সমাজ, সমাজ এমনই। মেয়েদের দোষ ধরে কেবল।

আচ্ছা আমরা এমন কিছুই করব না, যাতে লোকে আমাদের দোষ ধরতে পারে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মাধুরীলতার মুখ। ওর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে বুকটা কেমন জানি করে ওঠে অনিমেষের। ঠিক বুঝতে পারে না কোথায় টান পড়েছে। অনুভবটাই বা কী! এখন বিছানায় শুয়ে ভাবছে কী করে মুখ দেখাবে মাধুরীলতাকে। ও কি ওকে আর ভালো ছেলে বলবে? ভীষণ মন খারাপ হয় ওর। পাশাপাশি মাধুরীলতার বন্ধুত্ব হারানোর ভয় ওকে পেয়ে বসে।

কতক্ষণ কেটে গেছে ও জানে না। শুনতে পায় মাধুরীলতার গলা। কাঠ হয়ে কান খাড়া করে রাখে।

মাসি অনিমেষ কী করছে?

ঘরেই আছে। পড়ছে বোধহয়।

আজ স্কুলে যায় নি?

শুনেছিস তো রাতের ঘটনার কথা। তাই ওকে স্কুলে যেতে বারণ করেছি। কাল যাবে।

আচ্ছা তাহলে যাই। ওকে বলবেন আমি ওর খোঁজ নিতে এসেছিলাম।

ও মা সে কী কথা, ওর সঙ্গে দুটো কথা বলবি না? এমনিতে ওর মন খারাপ। তুই কথা বললে ও খুশি হবে।

ও আসবে শুনে অনিমেষ বিছানা ছেড়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। অঙ্ক খাতা টেনে নেয়। যেন ও মনোযোগ দিয়ে অঙ্ক করছে।

মাধুরীলতা ওর টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ তুলে তাকায়। নিজের থেকেই বলে, রাতে আমি অন্যায় আচরণ করেছিলাম মায়ের সঙ্গে। আমার উচিত হয়নি। স্যার ঠিক শিক্ষা দিয়েছেন।

তুমি যখন চেঁচাচ্ছিলে তখন যদি স্যার এই বাড়ির এলাকায় না থাকতেন! ইস অল্পের জন্য রক্ষা হলো না।

না, মাধুরী, আমার শিক্ষার দরকার ছিল, শিক্ষা হয়েছে। স্যার আমার ভালোর জন্যই করেছেন।

এটা যদি বুঝে থাক তাহলে আমার কষ্ট নেই। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও শিক্ষা হলো। এখন যাই, বলেই আঁচলের নিচে লুকিয়ে রাখা ছোট একটি পেয়ারা অনিমেষের টেবিলের ওপর রাখে ও। আস্তে করে বলে, যখন ইচ্ছা হবে তখন খেয়ো। তারপর বেরিয়ে যায় ও। অনিমেষ গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। পেয়ারাটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তারপর কামড় বসায়। দেখতে পায় পেয়ারার ভেতরটা লাল। ও বেশ আনন্দে পেয়ারা খায়।

মক্তব স্কুলের নিয়ম ছিল যারা বছরে একদিনও স্কুল কামাই করবে না তারা একটি বিশেষ পুরস্কার পাবে। ক্লাস সিক্স থেকে অনিমেষ পুরস্কারটি পেয়ে আসছে। ও গাঁয়ের বাইরে কোথাও বেড়াতে যায় নি। অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েও থাকে নি। তাই ওর স্কুল কামাই হয় নি। সামান্য জ্বরজারিকে ও পাত্তাই দেয় নি। সরোজিনীও স্কুল কামাইয়ের পক্ষে না। পেয়ারা খাওয়া শেষ করে ও মায়ের কাছে এসে বলে, মা এ বছরে আমি বোধহয় পুরস্কার পাব না।

তুই তো এ বছর ম্যাট্রিক দিবি। আর পুরস্কার কী? পড়তে মন চাইলে পড় গিয়ে, নইলে শুয়ে থাক। মাধুরী কিছু বলল?

ও একটা খাঁটি কথা বলেছে মা।

কী বলেছে?

বলেছে হেডস্যার যে শিক্ষা দিয়েছেন তা যদি আমি বুঝে থাকি তাহলে ওর কোনো কষ্ট নেই।

বড় লক্ষ্মী মেয়ে। সেজন্য তো ওকে তোর কাছে পাঠিয়েছি।

ভালো করেছ। আমার মন খারাপ কেটে গেছে ওর সঙ্গে কথা বলে। পড়তে যাই মা।

হ্যাঁ, যা। আমি তোকে এক গ্লাস পাতলা ডাল পাঠাচ্ছি। খেয়ে নিস। সঙ্গে এক বাটি মুড়িও দেব।

অনিমেষ ঘাড় নেড়ে চলে যায়।

মাধুরীলতা স্কুলশিক্ষক ভূদেব দত্তের মেয়ের ঘরের নাতনি। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় সর্বাণী নোয়াখালীর কাজিরখিলে শ্বশুরবাড়িতে ছিল। সর্বাণী ভূদেব দত্তের একমাত্র মেয়ে। পাঁচ ছেলের মধ্যে একমাত্র মেয়ে। ভূদেব দত্তের বড় আদরের, বড় যত্নের। মেয়ের জামাই কীর্তিনিশান ছিল স্কুলশিক্ষক। ভূদেব দত্তের মনের মতো জামাই। শিক্ষকতা ছিল কীর্তিনিশানের ব্রত। দাঙ্গায় মাধুরীলতার বাবা-মা নিহত হয়। নিহত হয়

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

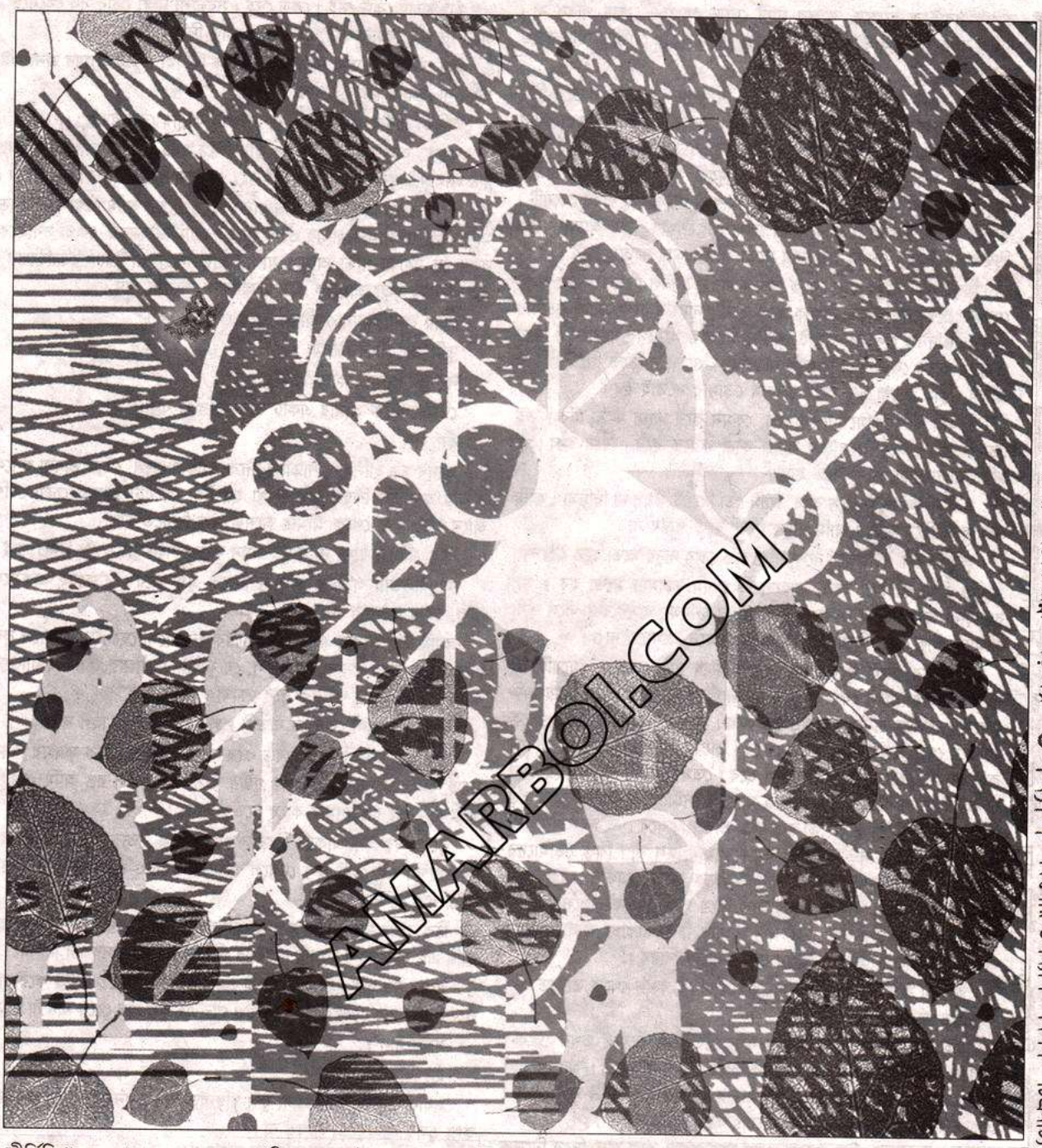

AMARBOI.COM

কীর্তিনিশানের বাবা-মাসহ পুরো পরিবার। মোট এগারোজন ছিল পরিবারের সদস্য। শুধু অলৌকিকভাবে বেঁচে যায় মাধুরীলতা। জ্ঞানহারা মাধুরীলতা রক্তের মাঝে পড়েছিল দেড়দিন। জ্ঞান ফিরে পাবার পরে মা-মা করে চিৎকার করছিল শুনে প্রতিবেশী সতীশ মজুমদারের স্ত্রী গিয়ে ওকে উদ্ধার করে আনে। জমাট বেঁধে থাকা রক্ত ওর শরীর থেকে পরিষ্কার করে দিয়েছিল ওই পরিবার। ওকে ভূদেব দত্তের কাছে দেওয়ার সময় হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সতীশ বলেছিল, ওর রক্ত পরিষ্কার করাই হলো আমাদের এই জীবনের পুণ্য। আমরা মুসলমান হতে রাজি হয়েছিলাম বলে ওরা আমাদের মারে নি। কীর্তিনিশানের বাবা রাজি হয় নি বলে সবাইকে মেরে চলে গেছে ওরা। শুনেছি মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়ে রক্তের মধ্যে ডুবেছিল আপনার নাতনি।

সেই নাতনিকে নিয়ে এখন তাদের দুজনের দিনযাপন। ও দাদু-দিদিমার কাছে বড় হচ্ছে। কীভাবে বেঁচে গিয়েছিল সেকথা ওকে বলা হয় নি। সে সময়ে আত্মীয়স্বজন অনেকে কলকাতায় চলে গেছে। কেউ কেউ বাড়িঘরে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। কেউ বিক্রি করতে পেরেছিল। কিন্তু ভূদেব কারও কথা শোনে নি। নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল। একটা

CHANNEL
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

কথাই সবাইকে বলেছে, স্কুলের মায়া ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। চল্লিশ বছর ধরে এই স্কুলে চাকরি করেছি। শিক্ষকতার পেশা আমার কাছে খুব পবিত্র।

তার ওপর কারও কোনো কথা চলে নি। পাঁচ ছেলেকে পাঠিয়ে দিল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। রেখে দিল নাতনিকে। মেয়ের শোক ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য তার নাতনিই যথেষ্ট ছিল। মাধুরীলতা নামটি তার রাখা। মেয়েটি যখন দাদু বলে গলা জড়িয়ে ধরে তখন এক মুহূর্ত সময় মাত্র—তার সামনে মাধুরীলতা ছাড়া আর সবকিছু মুছে যায়। আশ্চর্য এক মায়ার বাঁধন মেয়েটি। ভূদেব দত্ত ওকে বলে, তোকে আমি লেখাপড়া শেখাব। তুই আমার মতো শিক্ষকতা করবি। দেখবি পড়ানোর মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই।

মাধুরীলতা দাদুর কাছ থেকে শিক্ষকতার ব্রত নিল। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ধরে নেয় তাকে শিক্ষক হতে হবে। দাদুকে বলে, আমি তোমার মতো একদিনও স্কুল থেকে ছুটি নেব না। ছেলেমেয়েদের মনোযোগ দিয়ে পড়াব। ক্লাসে কেউ পড়া শিখতে না পারলে ওদের বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে আসব। তুমি দেখো দাদু আমি একদম তোমার মতোই হব।

দিদিমা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, কেমন করে দাদুর মতো হবি ? তুই তো মেয়ে। তোকে সংসারের কতো কাজ করতে হবে। বিয়ে হবে। মা হবি। বাচ্চাকাচ্চাদের দেখতে হবে।

ও খিলখিল করে হেসে বলে, আমি তো বিয়েই করব না দিদিমা। আমি তো জানি বিয়ে করলে আমি দাদুর মতো হতে পারব না।

অনিতা রানী গম্ভীর হয়ে বলে, না তোকে তোর দাদুর মতো হতে হবে না।

ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তাহলে কি আমি তোমার মতো হব ? শুধু রান্নাবান্না আর সংসার দেখাশোনা ? না, না দিদিমা, এসব কথা বলে তুমি আমাকে পিছু টেনে নিয়ো না। আমাকে সামনে এগোতে দাও।

চুপ করে থাকে ভূদেব দত্ত আর অনিতা রানী। ভাবে, মেয়েটি কি দাদুর ব্রত গ্রহণ করে ফেলেছে ? ও কি নিজেকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করবে ? অনিতা রানীর বুক ধড়ফড় করে। ভূদেব দত্ত একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কোনোকিছু খুঁজে ফেরে। ভাবে, যে কাজটি নিজের জীবনে করা হয় নি, সেটি হয়তো ওর দ্বারা হবে। তেমন একটি বড় গাছের ছায়া ফসিলের মতো ওর শরীরে আটকে আছে। সেটাকে ও আস্তে আস্তে বড় ক্যানভাসে পেইন্টিংয়ের মতো রঙে রঙে ভরিয়ে তুলবে। তখন মাধুরীলতা বলে, বাবা-মায়ের মৃত্যু বোঝার বয়স আমার ছিল না। কিন্তু তোমাদের কাছে সে মৃত্যুর কথা শুনেছি। দাদু আমাকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। তার কোনো স্মৃতি আমার মনে নেই দাদু। আমি ঠিক করেছি, আমার জীবন আমি বাবা-মায়ের আত্মার শান্তির জন্য নিবেদন করব।

অনিতা রানী ভেজাকণ্ঠে বলে, তুই এতকিছু কখন থেকে ভাবতে শুরু করেছিস রে ?

এই ধরো যখন থেকে আমার বুদ্ধি হতে শুরু করেছে তখন থেকে। তারপর দাদুকে দেখে। দাদু আমার কাছে দেবতার মতো। আগামীকাল থেকে আমি প্রতিদিন ভোরে দাদুর মাথার কাছে একটি করে ফুল রাখব। একটি ঘাসফুল হলেও তা আমি নিজের হাতে তুলে আনব।

ভূদেব দত্ত নাতনির মাথার ওপর হাত রেখে অন্য হাত দিয়ে নিজের চোখের জল মুছতে থাকে। তার গলা দিয়ে কথা বের হয় না। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ। একসময় নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, তোর মামারা তো চায় তোকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। তোকে সেখানে লেখাপড়া শেখাবে। যাবি ?

না, কখনো না। আমি এখানেই লেখাপড়া করব। তাছাড়া তোমাদেরকে ছেড়ে আমি পৃথিবীর কোথাও যাব না। তোমরা ছাড়া আমার আর কে আছে ?

অনিতা রানী কেঁদেকেটে অস্থির হয়ে যায়। ব্যাকুলভাবে নাতনিকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

হ্যাঁ, তোর কেউ নেই। কেউ নেই। সর্বনাশা দাঙ্গা তোর সব খেয়েছে। জানি না তুই কেমন করে এই জীবন পাড়ি দিবি।

যার কেউ নেই তার জন্য সবাই থাকে দিদিমা। তুমি আমার জন্য কষ্ট পাবে না। আমি ঠিকই চলতে পারব।

অনিতা রানীর কান্না থামে না। উল্টো কান্নার বেগ বাড়ে।

থামো, অলকের মা। ভূদেব স্ত্রীর পিঠে হাত রাখে। বলে, আমাদের কষ্ট আমরা মাধুরীকে দেখাতে চাই না। ও নিজে নিজে অনেককিছু বোঝে।

একজন বড় মানুষের হাত আমার মাথা ছুঁয়েছে। আমি বিশ্বাস করি বড় মানুষের ছায়া আমার মাথার ওপর আছে। আমি জীবনভর একথা সবাইকে বলব যে মহাত্মা গান্ধী আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। বাবা-মায়ের মৃত্যু আমাকে এই আত্মবিশ্বাস দিয়েছে দাদু।

তোর জন্য আমরাও জীবন ফিরে পেয়েছি রে।

তুমি জল খাবে দিদিমা ?

না, তুই আমার কাছে বসে থাক।

তোমাদেরকে আমার একটি ভাবনার কথা বলি ?

হ্যাঁ, বল।

ভূদেব দত্ত হাসিমুখে নাতনির দিকে তাকিয়ে বলে, তোর ভাবনা শুনলে আমার হনে হয় কিছুই বুঝি শেখা হয় নি। মেয়েটা আমার চেয়ে বেশি জানে। ওর কাছ থেকে আমার অনেক কিছু শিখতে হবে।

যাহ, কী যে বলো না দাদু। এমন করে বললে আমি খুব লজ্জা পাই।

মাধুরীলতার লজ্জিত ভঙ্গি দু'জনকে মুগ্ধ করে। দু'জনেই একসঙ্গে বলে, তোর ভাবনার কথা বল।

আমি ঠিক করেছি এই গাঁয়ের কয়েকজন ভালো ছেলেমেয়ের সঙ্গে ফুল দিয়ে বন্ধুত্ব করব। সাদা ছোট ফুল, যে ফুলটা এ গাঁয়ের প্রায় সব বাড়িতে আছে। ফুল খুঁজতে কাউকে দূরে কোথাও যেতে হবে না।

কিন্তু সাদা ফুল কেন রে নাতনি ? লাল ফুল ভালো ছিল না ?

লাল ? মাধুরীলতা চোখ বড় করে অনিতা রানীর দিকে তাকায়। এক মুহূর্ত থম ধরে থাকে। তারপর গম্ভীর স্বরে বলে, লাল রঙ আমি দেখতে পারি না। ওই রঙ আমার কাছে রক্তের মতো।

ভূদেব দত্ত গলা খাঁকারি দিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলে, তোর সাদা রঙ আমারও খুব পছন্দ। ওই ছোট ফুল দেখলে আমার নিজেরও মন ভরে যায়। আমি শান্তি পাই রে দাদু।

ঠিক বলেছ দাদু। সাদা ফুল দেখলে সবার শান্তির কথা মনে হবে সেজন্য আমি এই ফুল পছন্দ করেছি। আমার জীবনে শান্তি খুব দরকার দিদিমা।

ভূদেব দত্ত খুশি হয়ে বলে, আমি এ গাঁয়ের সব বাড়িতে একটি করে সাদা ফুলের চারা দেব। দেখব একটি বাড়িও যেন এই ফুল গাছ থেকে বাদ না পড়ে।

সত্যি দাদু ?

হ্যাঁ দিদিভাই, সত্যি।

সবার বাড়িতে যখন সাদা ফুল গাছ বড় হবে তখন কেউ আমরা কারও কথা ভুলব না। বুড়ো হলেও না।

কয়জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিস দিদিভাই ?

মাত্র তো শুরু করলাম। একজনের সঙ্গে করেছি।

কে সে ? কার ছেলে ?

তুমি তাকে চেন দাদু। ওর নাম অনিমেষ।

ভূদেব দত্ত মাথা নেড়ে বলে, ভালো ছেলে।

অনিতা রানীও সায় দিয়ে বলে, ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে। ওই বাড়ির সবাই বেশ ভালো।

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

তোমাদের সায় পেয়ে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে ভুল করি নি।

এরপর কে তোর বন্ধু হবে ?

শামসুন্নাহার।

ভূদেব দত্ত ভুরু কুঁচকে বলে, এয়াকুবের মেয়ে ?

হ্যাঁ দাদু, ঠিক চিনেছ। তোমার দেখছি শুধু ছাত্রীকে মনে থাকে না, ছাত্রীর বাবাকেও মনে রাখতে পারো।

ভূদেব মৃদু হেসে বলে, এয়াকুব মানুষ হিসেবে ভালো। নিরীহ, গোবেচারা। কৃষিকাজ ভালো বোঝে। সেজন্য ওর ঘরে খাদ্যের অভাব নেই।

শামসুন্নাহার আমার সঙ্গে পড়ে দাদু।

আমরা খুশি যে তুই বন্ধুত্ব করার জন্য ভেবে চিন্তে এগুচ্ছিস। মানুষকে বোঝার চেষ্টা করছিস। এটাও এক ধরনের শিক্ষা।

মাধুরীলতা দুজনকে প্রণাম করে বলে, আশীর্বাদ করো।

দুজনে একসঙ্গে ওর মাথায় হাত রেখে বলে, অনেক বড় হ দিদিভাই। মনে রাখিস মহাত্মা গান্ধীও তোকে আশীর্বাদ করেছেন। আমাকে বলেছিলেন তোমার নাতনিকে অহিংসার বাণী শেখাবে। সবাই তাকে বাপুজী ডাকে। তুইও সেভাবে তাকে স্মরণ করবি।

হ্যাঁ, তাই করব। তিনিও আমার কাছে বাপুজী। মাধুরীলতা বেণি থেকে সাদা ফুল খুলে দুজনের হাতের তালুতে রাখে। বলে, যতক্ষণ পার মুঠিবদ্ধ করে রাখো তোমরা। চোখ বুজে ভাব, বন্ধুত্বই শান্তি।

ভূদেব দত্তের চকিতে মনে হয়, বন্ধুত্বই তো অহিংসার বাণী। নাকি ? মেয়েটি তো ঠিকই ধরেছে—দাঙ্গা রক্ত। তাই লাল। বন্ধুত্ব ফুল। তাই সাদা। দুজনেই দেখতে পায় মেয়েটি উঠোন পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে। চুলোর সামনে গিয়ে বসেছে। অনিতা রানীর মনে হয় মেয়েটি মাঝে মাঝে আগুনের সামনে বসে চোখের জল মোছে। ওর কষ্টকে ও বড় একা একা আগুনে পোড়ায়। আগুনকে শুষে নিতে দেয় চোখের জল। অনিতা রানীর ভয় করে—মেয়েটিকে নিয়ে ভয়। ওর ভেতরে আগুন আছে—জল আছে— জোয়ার আছে—ভাটা আছে। তখন পাশ থেকে ভূদেব দত্ত বিড়বিড় করে বলে, ওর ভেতরে যে কী নেই তা আমি জানি না অলকের মা।

অনিতা রানী চমকে স্বামীর দিকে তাকায়। দেখতে পায় ভূদেব দত্ত নির্বিকার দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হয় সে এক ধুধু প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই প্রান্তরে ঘাস নেই, গাছ নেই। মাটি নেই, জল নেই। মানুষের জীবন কখনো এমন শূন্য হয়ে যায়। সেই শূন্যতার মাঝে মানুষ এক অসহায় প্রাণী। দুজনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। দুজনের কেউই ওঠার তাগাদা অনুভব করে না।

কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামটিতে একটি ঘটনা ঘটে।

গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি, কিন্তু দাপটের জায়গা দখল করে রেখেছে মুসলমানেরা। বিশেষ করে তারা, যারা মুসলিম লীগ রাজনীতির হর্তাকর্তা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিজ পেশায় খুব নিবেদিত। ছাত্রদের ভালোবাসেন, ওরা যেন ভালো রেজাল্ট করে সেদিকে খেয়াল রাখেন। শুধু খেয়াল রাখা নয়, কড়া নজরদারি করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে স্কুলটিকে গড়ে তোলার লক্ষ্যও আছে তার। পেশার আত্মিক দিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দিক তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য নানারকম কাজের সিদ্ধান্ত নেন। কাউকে জিজ্ঞেস করেন না। কারও কথার ধার-ধারেন না। বড় একগুঁয়ে মানুষ। মনে করেন, নিজে যা ভাববেন সেটাই শেষ কথা। স্কুলের হিন্দু শিক্ষকরা এজন্য তাঁর ওপর বিরক্ত। বলেন, মানুষটিকে বোঝা যায় না। কখনো এই রকম তো, কখনো ওই রকম। খামখেয়ালি। এমন মানুষকে মানা কঠিন।

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

AMARBOI.COM

হেডমাস্টারের চার-পাঁচটি গরু আছে। তারই হুকুমে গরুগুলোকে সন্ধ্যার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেগুলো নিজেদের মতো গাছপালা খেয়ে সাবাড় করে। কারও বাগান নষ্ট করে, কারও ক্ষেতের ফসল। হিন্দুদের কোনো ক্ষতি হলে তাদের মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। আপত্তি করার সাহস পায় না। একদিন রতন কর্মকারের শখের বাগানটি প্রায় পুরোটাই তছনছ করে ফেলে। বাড়ি ফিরে বাগানের অবস্থা দেখে রতন কর্মকারের চক্ষু চড়কগাছ। মাথা চাপড়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। বাড়ির অন্যরাও এই ঘটনায় চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। আশপাশের বাড়ি থেকে ছুটে আসে পঁচিশ-তিরিশ জন।

একজন চেঁচামেচি করে বলে, খুব অন্যায়। এভাবে গরুগুলো ছেড়ে দেওয়ার মানে কী?

মানে আবার কি? হেডমাস্টারের খেয়ালখুশি। যা খুশি তা করার সাধ। বুঝলে সাধ, মানুষ তার সাধ পূরণ করতে চায় আর একজনের ঘাড়ে পা রেখে।

নিকুচি করি সাধ পূরণের।

এত সুন্দর বাগানটা নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

কোনো শালা দেবে না। একজন গম্ভীর হয়ে বলে।

সুবোধনাথ মৃদু ধমক দিয়ে বলে, মুখ খারাপ করবে না কেউ। তারপর রতন কর্মকারের হাত ধরে বলে, শান্ত হও রতন। কেঁদে কী হবে। আমাদের কে আছে যে আমাদের জন্য এগিয়ে আসবে?

আমরা কি বিনা প্রতিবাদে সবকিছু ছেড়ে দেব?

কার কাছে প্রতিবাদ করবে রমেশ হালদার? সুবোধনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, ভুলে যেয়ো না যে আমাদের জন্য থানা-পুলিশ আছে কাগজেকলমে। বাস্তবে না। উল্টো ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে।

সুবোধনাথের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকে ছোট দলটি। বুঝতে পারে তারা এ দেশের নাগরিক হলেও নাগরিকত্বের জোরটুকু তাদের শক্তভাবে নাই। অদৃশ্য সুতোর টানে বড় একটি ফাঁক আছে। ফাঁকের জায়গাটুকু পূরণ করতে তাদের লড়াই করতে হবে। থানা-পুলিশের কথা মনে আসতেই ছোট দলটি যে উত্তেজনা নিয়ে কথা বলছিল তা দপ করে নিভে যায়। সুবোধনাথ রতনকে বলে, বাগানটা ঠিক করার জন্য আমরা কাল সকালে আসব। বাগানের জন্য যা করা লাগে তা করে আমরা বাগানটা সাজিয়ে দেব। তোমার মন খুশি হয়ে যাবে রতন কর্মকার।

সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে অনিমেষের মনে হয় জেঠা ঠিকই বলেছে। প্রতিবাদের সাহস বলে না ঠিকই, কিন্তু সবাই তো দলবেঁধে একটা কিছু করার কথা ভাবল। এটাই শক্তি।

মাস কয়েক পরে হেডমাস্টার মেয়েদের জন্য হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। শিক্ষকদের এ কথা বললে সবাই সায় দিলেন। বললেন, মেয়েদের জন্য গাঁয়ে হাইস্কুল নেই। একটি স্কুল হলে ভালোই হবে।

হ্যাঁ, খুব ভালো হবে। মেয়েরা লেখাপড়ায় এগিয়ে যাবে। প্রাইমারি স্কুলের টিচার হতে পারবে। হাসপাতালের নার্সও হবে।

হেডমাস্টার খুশি হয়ে বললেন, আপনাদের সমর্থন পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে।

কোথায় স্কুল করবেন?

সেসব তো ভাবি নি। দেখেশুনে একটা জায়গা বের করে নেব।

ভূদেব দত্ত বলে, জমিদারদের ছেড়ে যাওয়া অনেক জায়গা পড়ে আছে। সেখান থেকে একটি জায়গা দেখা যেতে পারে।

ওসব আপনারা আমার ওপর ছেড়ে দেন। স্কুলের জন্য বাকি সব কাজ আমি করব।

অন্য শিক্ষকরা চুপ করে থাকে। সবাই জানে হেডমাস্টার নিজের খুশিমতো কাজটি করবে। তারসঙ্গে আর কোনো আলোচনা চলবে না। তিনি শুনবেন না কারও কথা। কোনো পরামর্শ দিতে চাইলে বিরক্ত হবেন। ভালোমন্দের এমন যোগ খুব কম মানুষের মধ্যেই থাকে। যে যার মতো চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। এখন ঘরে ফেরার পালা। হিন্দু শিক্ষকদের মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর হয় না। হেডমাস্টার কী করবেন, এই দুশ্চিন্তা তাদের মাথায় গেঁথে থাকে।

মাসখানেক পরে দেখা গেল ধনী হিন্দুদের ফেলে যাওয়া কোনো জায়গাই তিনি পছন্দ করলেন না। বেছে নিলেন কালীবাড়ি মন্দিরের পাশের বড় জায়গাটি। একদিন মন্দিরের পুরোহিতকে ডেকে বললেন, গাঁয়ে মেয়েদের জন্য হাইস্কুল নেই। স্কুল দরকার। কালীবাড়ি মন্দির চত্বরের অর্ধেক জায়গা ছেড়ে দিতে হবে।

আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে যায় পুরোহিতের চোখ। ঢোক গিলে বলে, সে কী করে হয়? আমি এটা করতে পারব না মাস্টারমশায়। কালীবাড়ি মন্দিরের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার মতো পাপ কাজ আমি করতে পারব না। না, না মাস্টারমশায় আমাকে এমন কাজ করতে বলবেন না। আমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

হেডমাস্টার চোখ গরম করে বলেন, আপনাকে দিয়ে হবে না, না? তাহলে আপনি ছেড়ে দিতে রাজি নন?

না, না, মাস্টারমশায় এ কাজ আমি জীবন গেলেও করতে পারব না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

আচ্ছা দেখা যাবে। এখন আসুন।

বেদনাহত অসহায় মানুষটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ইচ্ছে হয় জ্বলে উঠতে, সাহস হয় না। ইচ্ছে হয় বুক-উজাড় করে কাঁদতে, পারে না। নিজের ওপর করুণা হয়। নিজেকেই প্রশ্ন করে, কেন কাঁদব? অপরাধ কী? এক-পা দু-পা করে স্কুলের চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে আসে পুরোহিত।

কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

থমকে দাঁড়ান পুরোহিত। লোকটির দিকে তাকিয়ে বলেন, হ্যাঁ, খারাপ লাগছে।

আমি আপনাকে ধরব?

না। তুমি তোমার পথে যাও।

আমি আপনার পেছন পেছন আসি?

পুরোহিত এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, আস।

তিনি হাঁটতে শুরু করেন। একসময় দেখতে পান মন্দিরের প্রাঙ্গণে পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার পেছনে একজন লোক মাত্র নেই। অনেকজন এসেছে। কেন এসেছে তারা? বোধহয় একটি প্রশ্নের উত্তর পেতে। কিন্তু, তিনি তো এর উত্তর দিতে পারবেন না। এখনো উত্তর দেওয়ার সময় হয় নি। তিনি সবাইকে নিরস্ত করে একা একা মন্দিরে প্রবেশ করেন। কিন্তু প্রাঙ্গণের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। এগোতে কষ্ট হয়। বুকের ওপরে বিশাল পাথর যেন চেপে আছে। চারদিকে তাকান। কলাগাছের পাতাগুলো আশ্চর্য সবুজ—বৃষ্টিস্নাত পাতার ওপরে এক চিমটি ধুলো নেই। বুকভরে শ্বাস নেওয়ার জন্য হাঁ করে টের পান ঠিকমতো শ্বাস ফেলার মতো দম নেই। তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

পনেরো-কুড়ি দিন পরে গাঁয়ের কয়েকজন মুসলমানসহ মন্দির-চত্বরের প্রায় হাজারখানেক কলাগাছ কেটে বিশাল আঙ্গিনা দখল করে হেডমাস্টারের বাহিনী। তিনি গাছকাটার জন্য নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের হুকুম দিয়েছিলেন। মুসলমান ছাত্রদের অনেকে মহা-উৎসাহে ছুটে যায় গাছ কাটতে। হই হই-রই রই শব্দে মাতিয়ে তোলে স্কুলের চারপাশ। অনিমেষ টিচার-কমনরুমে ছুটে আসে। দেখতে পায় স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে হিন্দু টিচাররা। কেউ ওর দিকে তাকান না। উত্তেজনায় পা কাঁপে অনিমেষের। ও কী করবে তা বুঝতে পারছে না। শিক্ষক সুকুমার বিশ্বাসের কাছে গিয়ে বলে, স্যার আমি কী করব? আমার কী করার আছে? আমি কলাগাছ কাটতে যাই নি। যাব না।

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

সুকুমার বিশ্বাস ওর কথার উত্তর দেন না। অন্য শিক্ষকরাও না। সবাই জানে হেডমাস্টারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তাদের নেই। এভাবে অপমানে পুড়ে যন্ত্রণা সয়ে থাকতে হবে। সবাই জানে থানা-প্রশাসন হেডমাস্টারের পক্ষে। পুলিশ তাদের পক্ষের প্রবল শক্তি। মেরে লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিলেও কেউ কথা বলবে না। রঙ্গলাল মাস্টার খুকখুক কাশেন। শরীর ভালো যাচ্ছে না। দু'হাতে চোখ রগড়ে বলেন, এ দেশ আমাদের নয়।

সুকুমার বিশ্বাস অনিমেষকে বলেন, তুমি এখন যাও।

অনিমেষ টিচার-কমনরুম থেকে বের হয়ে আসতে আসতে ভাবে, তাহলে কোন দেশ তাদের ? ইন্ডিয়ায় গেলে তো লোকে ওদেরকে রিফিউজি বলে। ওরা কি তাহলে দেশহীন মানুষ ?

বুকের ভেতর প্রবল কিছু চড়চড় করে। যেন সবকিছু ভেঙে পড়ছে। কীভাবে এসব ঠেকানো যাবে ? ও কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না। বন্ধুদের এড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সরোজিনী জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তোর ? কারও সঙ্গে ঝগড়া করেছিস ?

ঝগড়া করতে পারি নি। করা উচিত ছিল। মা তুমি আমাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

বেশ তো, কত তাড়াতাড়ি তুই বড় হয়ে গেলি। বেলের শরবত খাবি ?

খাব মা। বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মাগো আমি কি দুই গ্লাস শরবত পাব ?

দেব আয়।

কারটা দেবে ? তোমারটা না বাবারটা ?

দুজনেরটাই। নে। তুই যদি সবটুকু শরবত খেতে চাস তাহলে আমি সব তোকেই দেব বাবা।

না, মা, কারোটাই দিয়ো না। যার যার ভাগ তাকে দাও।

তুই না বললি তোর বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে ?

হলেই অন্যটার খেতে হবে নাকি মা ? অন্যেরটা যে খেতে হয় না এ শিক্ষা আজ আবার খুব হয়েছে।

কথা বলা শেষ করেই ও মায়ের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে। তারপর ঘরে ঢোকে। মায়ের কোনো প্রশ্নের উত্তর ও আর দিতে চায় না। চেয়ারের ওপর পা উঠিয়ে বসে ও মাথাটা পেছনে হেলিয়ে রাখে।

পরদিন মুজিবুল ওকে বলে, তুই যে কলাগাছ কাটতে গেলি না ? আমরা সবাই গেলাম।

কলাগাছ কাটার কাজটা কি ঠিক হয়েছে মুজিবুল ? জোর করে হিন্দু সম্পত্তি দখল করে নেওয়া হলো না ? মেয়েদের জন্য একটি হাইস্কুল করা হবে তা খুবই ভালো কথা। কিন্তু সবার সঙ্গে আলোচনা করে তো জায়গাটা ঠিক করা যেত। মন্দির তো হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

বাব্বা, তুই দেখছি একটি বক্তৃতা দিয়ে ফেললি। ভালো ছাত্র তো কথাও গুছিয়ে বলতে শিখেছিস। গুড। এরপর মুজিবুল গলা উঁচিয়ে বলে, মূল মন্দিরের তো কোনো ক্ষতি হয় নি। খালি জায়গায় একটি স্কুল হলে অসুবিধা কোথায় ? তোর গায়ে এত লাগছে কেন ?

মুজিবুলের সঙ্গে তর্ক করার ইচ্ছে হয় না অনিমেষের। ও বুঝে যায় যে মুজিবুল একইভাবে কথা বলবে। নিজের পক্ষে যত ধরনের যুক্তি আছে তা বলবে। একটি মসজিদের জায়গা এভাবে দখল করে নেওয়া হলে ও বুঝতে পারত বিষয়টি কত মর্মান্তিক। একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আবেগ বোঝার মানসিকতা ওর নেই।

মুজিবুলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জহির ও তমিজ বলে, হেড স্যারের এভাবে কাজটি করা উচিত হয় নি।

অনিমেষ সঙ্গে সঙ্গে বলে, স্যার আলোচনা করে কাজটা করতে পারতেন। জোর করে কাজটা করা ঠিক হয় নি। এভাবে কাজ করে হিন্দুদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

জহির মাথা নেড়ে বলে, ঠিক বলেছিস। দেশভাগের সময় যেমন এলাকার অনেক হিন্দু পরিবার ইন্ডিয়া চলে গিয়েছিল, এমন ঘটনা ঘটতে থাকলে আরও অনেকে চলে যাবে।

মুজিবুল হে হে করে হেসে বলে, গেলে যাবে। ক্ষতি কী ? যার যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে থাকবে। ভীতু মানুষেরা যেখানে থাকবে সেখানেই ভয় পাবে। ঠিক বলেছি ?

অনিমেষ চেঁচিয়ে বলে, মোটেই ঠিক বলিস নি। যা খুশি তা বলা মোটেই ভালো কাজ না।

মুজিবুল ওদেরকে ভেংচি কেটে মাঠের মাঝ দিয়ে দৌড় দেয়। তমিজ অনিমেষের ঘাড়ে হাত রেখে বলে, মন খারাপ করিস না। চল নদীর ধারে যাই। করিম চাচাকে পেলে তার নৌকায় করে মাছ ধরতে যাব।

করিম চাচা একসঙ্গে তিনজনকে নিতে পারবে না। তোরা যা। আমি বাড়িতে যাই। ভাত খেয়ে বাজারে যাব।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অনিমেষ দূর থেকে মাধুরীলতাকে দেখতে পায়। বাতাবিলেবু গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ রঙের শাড়ি পরা, সঙ্গে লাল রঙের ব্লাউজ। এই বয়সে মাধুরীলতা বেশ লম্বা হয়েছে। ছিপছিপে শরীর। অনিমেষের কখনো মনে হয় নি যে ভারী সুন্দর দেখতে। কোথায় যেন বাঁকানো ভাব আছে। অনিমেষ নিজের মাথা ঝাঁকিয়ে নেয়। ও কেন মাধুরীলতার কথা ভাবছে ? আর ভাববে না মনে করে মাধুরীলতার মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

মাধুরীলতা সরাসরি জিজ্ঞেস করে, দখল হয়ে গেছে, না ?

সে তো কালই হয়েছে।

না, ভাবলাম, যদি কোনো আপোষ রফা হয়। যদি দ্বিতীয় ভাবনার সুযোগ থাকে। তাহলে সব শেষ ?

অনিমেষ ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ। আর কিছু হবে না। তোমার কষ্ট লাগছে মাধুরী ?

মাধুরীলতার চোখ জলে টলটল করে। আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকে। তারপরও অনিমেষের মনে হয় মাধুরীলতা ভাঙে নি, শক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। ও বুঝে যায়, মাধুরীলতা ভাঙার মেয়ে নয়। ওর ভেতরের জোরটা অন্যরকম। বাবা-মায়ের ভালোবাসা মাথার ওপরে না থাকলে কেউ কেউ বোধহয় নিজের জন্য ছায়া নিজেই তৈরি করে। অনিমেষ আস্তে করে বলে, কেঁদ না মাধুরী। মূল মন্দিরের কোনো ক্ষতি হয় নি। একদম ঠিক আছে।

মাধুরীলতা চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে ঘাড় টান করে বলে, তাতে কী হলো ? এতে কি সান্ত্বনা হয় ? বলো হয় ?

অনিমেষ ওর কথায় ঘাবড়ে যায়। তাড়াতাড়ি বলে, না না তা হয় না। তুমি ঠিকই বলেছ। তবে হেড স্যার মানুষটা কেমন জানি। তাকে বোঝা যায় না।

আমি জানি তুমি বলবে যে তিনি তো অঘোর স্যারের মেয়ে তমসীর বিয়ের খরচ সব দিচ্ছেন। এসব দিয়ে কি বোঝা যাবে অনিমেষ ?

এসব দিয়ে আমি একজন মানুষকে বুঝি না। এটাই বলতে চেয়েছি। হেড স্যার অঘোর স্যারকে বলেছেন, তার চার মেয়ের বিয়ের খরচের দায়িত্ব তার। তিনি ব্যবস্থা করে দেবেন। আমরা তো জানি অঘোর স্যারের অবস্থা বেশি ভালো না। সংসার অনেক বড়। সেই তুলনায় আয় কম। সেজন্য হেড স্যারের ভালোমন্দ আমি বুঝতে পারি না। তোমার কী মনে হয় ?

আমার সামনে সবকিছু পরিষ্কার। শোনো, তিনি ছোট সুযোগ দিয়ে বড় সুযোগগুলো দখল করে রাখবেন। সমাজের সব মানুষকে চালানোর দায়িত্ব থাকবে তার হাতে। তিনি নিজেকে রাজার মতো ভাববেন।

রাজা ? অনিমেষ খানিকটুকু অবাক হয়, খানিকটুকু না বোঝার কারণে বিব্রত বোধ করে।

মাধুরীলতা জোর দিয়ে বলে, রাজাই তো। মানুষের ওপর রাজত্ব করে যে সেই তো রাজা।

AMARBOI.COM

তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। আমি তোমার মতো বুঝতে পারি না। যাই।

অনিমেষ আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির পথে যায়। বাড়িতে ঢুকে মা ও জেঠির মুখোমুখি হতে চায় না ও। কুয়োতলায় হাতমুখ ধোয়ার সময় মনেপ্রাণে চায় একটি ঘুঘু ডাকুক। কিন্তু কোথাও ঘুঘুর ডাক নেই। আশপাশে বোধহয় মাও নেই। রান্নাঘরের দিকে তাকালে দেখতে পায় জেঠি রান্না করছে। ওকে কেউ ডাকে না। ও হাতমুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে।

কয়েক মাস পরে আবার একটি ঘটনা ঘটে। গাঁয়ের কয়েকজন লোককে ডেকে হেডমাস্টার একদিন বললেন, আমার মাথায় একটি চিন্তা এসেছে। রাস্তার ঠিক করার চিন্তা।

আপনি কি কলাদী চাঁদপুরের রাস্তার কথা ভাবছেন স্যার? রাস্তাটা বড় আঁকাবাঁকা।

হ্যাঁ, এই রাস্তার কথাই ভাবছি। আঁকাবাঁকার কারণে রাস্তার দূরত্ব বেড়ে যায়।

ঠিক বলেছেন স্যার। হেঁটে আসতে খুব কষ্ট হয়।

আমি তাই ভাবছি যে ওটাকে সোজা করলে আমাদের চলাচলের কষ্ট কমে যাবে। অন্তত দূরত্ব কমবে।

উপস্থিত সবাই হেডমাস্টারের কথায় সায় দিয়ে বলে, ঠিক কথা স্যার, ঠিক কথা।

তখন আকস্মিক বজ্রপাতের মতো বেজে ওঠে হেডমাস্টারের কণ্ঠ। তিনি সবার মাথার ওপর দিয়ে দূরে দৃষ্টি ফেলে বলেন, রাস্তাটা সোজা করতে হলে ভূদেববাবুর বাগানবাড়িটি আমাদের দরকার হবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আতঙ্ক-উদ্বেগে বিস্ফারিত হয়ে যায় ভূদেব দত্তের চোখ। অন্যান্য শিক্ষক যারা উপস্থিত ছিলেন তারাও নিজের কানকে বুঝি বিশ্বাস করতে পারছে না। ভাবে, হেডমাস্টারের কণ্ঠ ঠিক শুনতে পেয়েছেন তো? নাকি অন্য কেউ? অন্য কোথাও থেকে কথা বলছে? ভূদেব দত্ত উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে। অন্যরা হাত ধরে টানলে আবার বসে পড়ে। শরীর কাঁপে থরথর করে।

হেডমাস্টার তখন গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ভূদেববাবু গ্রামের মানুষের চলাচলের স্বার্থে আপনাকে বাগানবাড়ির মায়া ছাড়তে হবে। জায়গাটাকে রাস্তার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে গ্রামের মানুষের?

আপনি এটা কী বলছেন মাস্টারমশায়? আমি তো জমিদার না। আমার ওইটুকু সম্পত্তি সম্বল। এটুকু ছেড়ে দিলে আমার চলবে কী করে?

আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? বসুন, বসুন।

আশপাশের সবার এমন অনুরোধ সত্ত্বেও বসতে পারে না ভূদেব দত্ত। কথা বলতেই থাকে। আবেগ-উত্তেজনায় গলা কাঁপে। কথা ভেঙে যায়। প্রতিটি শব্দ ঠিকমতো বোঝা যায় না। সমবেত মানুষ হাঁ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। ভূদেব দত্ত চারদিকে তাকায়। প্রত্যেক মানুষ তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখে। শুনতে থাকে তার কণ্ঠস্বর ? আমি সারা জীবন আপানাদের সেবা করেছি। শিক্ষকতা শুধু আমার পেশা না, আমার চৌদ্দপুরুষের জ্ঞান। ছাত্রদের আমি প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। ওদেরকে বিদ্যা শেখাতে পারলে নিজে ধন্য হই। সেজন্য একদিনও স্কুল থেকে ছুটি নেই নি।

বলতে বলতে দু'হাতে চোখ মোছে ভূদেব দত্ত। কিন্তু কথা থামাতে পারে না। বলে, মাস্টারমশায় আমার সম্বল মাত্র ওইটুকু সম্পত্তি। আপনার কাছে আমার জোড়হাত নিবেদন, আপনি আমার ভূমিটুকু কেড়ে নিবেন না। যদি নিতেই হয় তাহলে আমাকে ক্ষতিপূরণ দিবেন। আমি অন্যখানে আর এক টুকরো জমি কিনব।

কী বললেন? ক্ষতিপূরণ?

তাইতো হওয়া উচিত মাস্টারমশায়। তাহলেই রাস্তার জন্য জমি ছেড়ে দিতে পারব। নইলে কেমন করে দেব?

হেডমাস্টার রাগত স্বরে বলেন, আপনার অনেক সাহস ভূদেব বাবু। মনে রাখবেন দেশভাগ হয়ে গেলেও এখনো ছেচল্লিশের দাঙ্গার ঘা শুকায় নি। নোয়াখালীও বেশি দূরে না। আমাদের প্রতিবেশী এলাকা। ভুলে যাবেন না যে চাঁদপুর মহকুমার ফরিদগঞ্জ থানাতেও দাঙ্গা হয়েছিল।

সমবেত মানুষের মধ্যে অস্ফুট ধ্বনি ওঠে। প্রত্যেকে এই কথায় অস্বস্তি বোধ করে। কেউ একজন মিনমিন করে বলে, আবার কি একটা দাঙ্গা বাধবে নাকি?

কেউ তার কথার গুরুত্ব দেয় না। মৌলবি হাসানুদ্দিন জোরে জোরে বলে, এসব কথা আমাদেরকে আর মনে করাবেন না মাস্টারসাহেব। নোয়াখালীর দাঙ্গায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন গান্ধীজী। সন্ধ্যায় তিনি যে প্রার্থনা সভা করতেন সেই সভায় সব ধর্মের মানুষ যোগ দিতে পারত। চাঁদপুরের সভায় আমিও যোগ দিয়েছিলাম।

হেডমাস্টার গম্ভীর স্বরে চোখ বড় করে বলেন, আপনি কী বোঝাতে চান মৌলবি সাহেব?

আমরা হাঙ্গামা চাই না। গ্রামে শান্তি চাই।

ও তাই, গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নতি চান না?

সেটাও চাই। তবে বুঝেশুনে করতে হবে।

আপনি বসেন, বসেন।

পেছন থেকে বেশ কয়েকজন সমস্বরে কথা বলে।

মৌলবি হাসানুদ্দিন পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ায়। কেউ আর কথা বলে না। অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে।

হেডমাস্টার গম্ভীর স্বরে বলে, আপনি বসেন মৌলবি সাহেব। আমার মনে হয় এই গাঁয়ের সব মানুষের জনসেবার মানসিকতা থাকা উচিত।

কেউ আর কথা বাড়ায় না। সভা ভেঙে যায়।

তারপর একদিন ভোরে দেখা যায় পঁচিশ-ত্রিশ জন মানুষ ভূদেব দত্তের বাগানবাড়ির গাছ কেটে ফেলছে। বড় বড় গাছগুলো হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। চারদিকে ধুপধাপ শব্দ।

ভূদেব দত্ত চিৎকার করে দৌড়াতে থাকে। তার পেছনে মাধুরীলতা। ও নিজেও চিৎকার করে কাঁদছে। অনিমেষও ওদের সঙ্গে যায়। ভূদেব দত্ত হেডমাস্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

এটা কি করলেন হেডমাস্টার মশায়?

তিনি চোখ না তুলে শীতল কণ্ঠে বললেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং স্কুলের প্রয়োজনে এ জায়গাটির খুব দরকার ছিল। যা করেছি বুঝেসুঝে করেছি। আপনি কোনো কথা বলবেন না।

ভূদেব দত্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু কাঁদতে পারছে না। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা আশপাশে ভিড় করেছে। কিন্তু কারও মুখে কথা নেই। বুকে যত গর্জনই থাকুক, মুখে তার প্রকাশ নেই। তখন হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে ভূদেব দত্ত। অন্যরও নিঃশব্দে চোখ মোছে।

হেডমাস্টার দাঁড় কিড়মিড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে ধমকের স্বরে বলে, কোনো ঝামেলা করবেন না ভূদেব বাবু। বাড়াবাড়ি করলে বিপদে পড়বেন। আমি যা ভালো মনে করি, তা করি। সবার স্বার্থের কথা চিন্তা করে করি। আপনারা যে মানতে পারেন না এটা খুব খারাপ লাগে।

স্যার, আমি একটা কথা বলতে চাই ?

মাধুরীলতার চিকন কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলে সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকায়। হেডমাস্টর দ্রুতকণ্ঠে বলে, তুমি তোমার দাদুকে নিয়ে বাড়ি যাও মাধুরীলতা।

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM

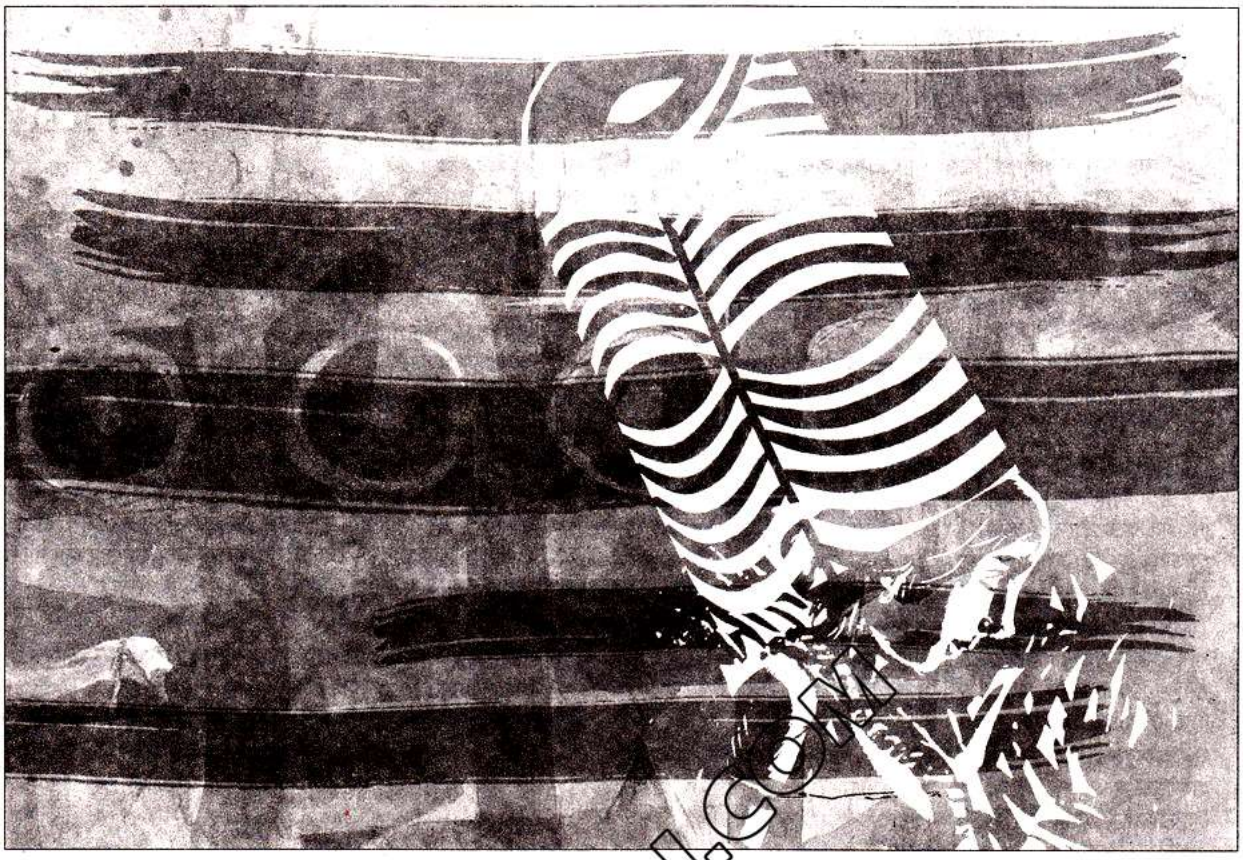

মাধুরীলতা দাদুর হাত ধরে টেনে বলে, চলো দাদু। তোমার এখন বসে ওষ্টচরবৃত্তি করছেন। আপনি পঞ্চমবাহিনীর লোক। আপনাকে যে কোনো মোয়া-মুড়ি খাওয়ার সময়। সময় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। বুঝেছেন ? যান, বাড়ি যান।

ভূদেব দত্ত নড়ে না। বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তখন হেডমাস্টারের ঘরে ঢোকে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। খবরাখবর কোনোকিছু না জানার চেষ্টা করেই বলে, কী হয়েছে ? আপনারা হইচৈ করছেন কেন ? একটুখানি জমি দান করতেও বুক ভেঙে যায় ? কেমন মানুষ আপনি ?

একটুখানি জমি ? আপনি কী করে এটা বললেন চেয়ারম্যান সাহেব ? আমার তো ওইটুকুই সম্বল।

দেখতে পাচ্ছি জনসাধারণের জন্য ভালো কাজ করার কোনো ইচ্ছাই আপনার নাই।

আমি তো ছেলেদের বিদ্যাদান করি। শরীর খারাপ লাগলেও স্কুল থেকে একদিনও ছুটি নেই নি। যে ছেলে যে বিষয়ে কাঁচা সে বিষয়টি ওকে বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে আসি।

ওহ, খুব একটা বাহাদুর হয়েছেন। ব্যঙ্গের হাসি হাসে চেয়ারম্যান। এইটুকু কাজ করেই ভাবছেন অনেক কিছু করে ফেলেছেন! হা-হা হাসিতে ঘর কাঁপিয়ে দেয় চেয়ারম্যান। তাকে দেখে অন্য শিক্ষকরা আগেই একে-দুয়ে বেরিয়ে গেছে। যেতে পারে নি ভূদেব দত্ত। কারণ আক্রমণটা তাকেই করা হয়েছে। আর এমন একটি আক্রমণ করবে বলেই যেন চেয়ারম্যান ঘরে ঢুকেছে।

দাদু চলো।

মাধুরীলতা ভূদেব দত্তের হাত ধরে জোরে জোরে টানে। দু'পা বাড়িয়ে আবার দাঁড়াতে হয় ভূদেব দত্তকে। কারণ চেয়ারম্যান তখন বলছে, ছেলেদের ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দিয়ে ওখানে একটি ঘাঁটি গেড়েছেন। নিজে দেশে

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মিলনকান্তি বেরিয়ে যায়। ভূদেব দত্ত বুঝতে পারে তার বুকের ভেতরে বাতাস নেই। দম ফেলতে পারছে না। মাধুরীলতার হাত ধরে বেরিয়ে আসে। সবশেষে বের হয় অনিমেষ। ওরা চারজন চুপচাপ স্কুল-প্রাঙ্গণ পার হয়ে আসে। গাছকাটার শব্দ তখনো ভেসে আসছে। সঙ্গে কোলাহল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে পায় সুবোধনাথ ও অমিয়নাথ দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসছে। অনেকটা ছুটতে ছুটতে বলা যায়। প্রবল উৎকণ্ঠা দু'ভাইয়ের চোখমুখে। ওরা এসেই ভূদেব দত্তের দু'হাত ধরে। ভূদেব দত্ত চোখ মুছতে মুছতে বলে, সম্পত্তিটা গেল। কিছু হবে বলে মনে হয় না। চেয়ারম্যান যেভাবে কথা বলল, তাতে মনে হয় ওরা আঁটঘাঁট বেঁধেই নেমেছে।

মাধুরীলতা দাদুর সামনে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে বলে, দাদু দাঙ্গায় তোমার মেয়ে খুন হয়েছে। সেই শোক সয়ে তুমি বেঁচে আছ। মনে করো তোমার আর একটি মেয়ে খুন হয়েছে। তাহলে তোমার কষ্ট কম হবে।

দাঙ্গা ? খুন ?

মিলনকান্তি জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ ভূদেব বাবু দাঙ্গা। এটাও আর একটি দাঙ্গা। তাহলে আমাদের বাপুজী কই ? কার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে মন শান্ত হবে ?

এ কথার উত্তর কারও জানা নেই। শুধু মাধুরীলতা বিড়বিড় করে বলে, বাপুজী, বাপুজী। তিনি আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন। তাঁর এই ছোঁয়া পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। দুঃখ পেলে তাকে দেখতে পাই। তার কথা মনে করি।

AMARBOI.COM

CHANNEL i
হৃদয়ে বাংলাদেশ
প্রবাসেও বাংলাদেশ

সুবোধনাথ স্তব্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য বলে, দেওভোগ গ্রামে আমাদের ভিটেটা আমরা তাও অল্পকিছু দামে বিক্রি করতে পেরেছিলাম। এই গাঁয়ে এসে আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছি। ভালোবাসা না পেলে আমরা উদ্বাস্তু মানুষ হয়ে থাকতাম।

মিলনকান্তি বাধা দিয়ে বলে, থাক এসব কথা। এ দেশটা আমাদের নয়। তার কণ্ঠস্বর তিক্ত শোনায়।

তাহলে কোন দেশটা আমাদের ?

সুবোধনাথের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকারে সবাই ওদের দিকে তাকায়। ভাবে, দেখার কী আছে! দেশভাগ হলে এমনই তো হবে। মানুষ কুকুর-শেয়াল হবে ? কুকুর-শেয়াল মানুষ!

মাধুরীলতা হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, আমরা দেশহীন মানুষ। এই দেশে আমাদের জন্য নদী আছে, গাছ আছে। দরকার মতো নদীতে ডুবে মরব, গাছে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলব।

ভূদেব চিৎকার করে বলে, থাম দিদিভাই। থাম, থাম।

থাম, থাম শব্দ চারদিকে ধ্বনিত হতে থাকে, কিন্তু ছোট্ট দলটির সবাই চিৎকার করে কাঁদে। কেউ থামতে পারে না। যেন থামা শব্দের অর্থ ওরা কেউ জানে না। কান্না ছড়াতে থাকে চারদিকে। এগিয়ে আসতে থাকে মানুষ।

ওদের কণ্ঠস্বর ভাসতে থাকে বাতাসে। দাঁড়িয়ে থাকা মানুষেরা শুনতে পায় ওদের আর্তনাদ। আর্তনাদে ভারী হয়ে ওঠে বাতাস, গ্রাম ? গ্রামের সবটুকু। ওরা বলছে, আমরা ছেচল্লিশের দাঙ্গা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষ। দাঙ্গা নোয়াখালীতে শুরু হলেও চাঁদপুরও বাদ যায় নি।

আমরা আসছি চাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে ? চোলদানা, সাইসাঙ্গা, হাইমচর, আষ্টা, কড়ইতলী, ভূটালগ্রাম, তাম্রশাষণ, আইটপাড়া, জয়শ্রী, গোবরচিত্রা, চৌরাঙ্গ, গড়িয়ানা, বড়গাঁও, বারপাইকা, লাউতলী, পোয়া, গজারিয়া, চরবড়ালি, চরপাইকা, রূপসা—

আমরা কত নাম বলব, এমন আরও গ্রাম আছে।

মিলিয়ে যায় একদল মানুষ। তাদের পায়ের ধুলো ভাসতে থাকে চারদিকে। ধুলোর আড়ালে আবছা হয়ে যায় আশপাশ।

মাধুরীলতা অস্ফুট কণ্ঠে বলে, আমার মনে হয় আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না দাদু। চারদিক অন্ধকার লাগছে।

আমরা নোয়াখালীর সায়েস্তাগঞ্জ থেকে আসছি। সেখানে চারদিক অন্ধকার করা ঘটনা ঘটেছিল। আমি সুহাসিনী দাস। আমি চিত্তবাবুর বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে এসেছি।

তখন দাঁড়িয়ে থাকা দলটির সবাই একসঙ্গে বলে, আমরা সেদিনের ঘটনাটি শুনতে চাই।

ভেসে আসে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর : তিনি একটি মহালবাড়িতে থাকতেন। অনেক বড় বাড়ি। কয়েকশ লোক দাঙ্গা শুরুর পরদিন সেই বাড়িটি আক্রমণ করে। চিত্তবাবু তার মা, একজন পূজারি ও একজন বন্ধুকে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে দাঙ্গাকারীদের বাধা দিতে শুরু করেন। সকাল আটটা থেকে বেলা দু'টো পর্যন্ত দুই পক্ষের লড়াই চলতে থাকে। তিনি ইটের টুকরা, সোডার বোতল ছুড়ে আক্রমণকারীদের ঠেকান। পরে বন্দুক ব্যবহার করেন। বন্দুকের গুলি বেশি ছিল না। সেজন্য সাবধানে ব্যবহার করছিলেন। তিনি তিনতলার ছাদে ছিলেন। আক্রমণকারীরা বাড়ির নিচতলায় আগুন লাগিয়ে দেয়। দাউদাউ জ্বলতে থাকে আগুন। ধসে পড়তে শুরু করে বাড়ির ছাদ। তখন তিনি নিজের হাতে মাকে দু'টুকরো করে কেটে আগুনে ফেলে দেন। পরে পূজারি ও বন্ধুকেও আগুনে ফেলে দেন। তার বন্দুকের গুলি শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজের বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে আগুনে লাফিয়ে পড়েন। আক্রমণকারীরা তার মাথা কেটে নিয়ে বাড়ির সামনের গাছে ঝুলিয়ে রাখে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মাধুরীলতা। একটুপরে কান্না শোনা যায় অনিমেষের। এরপরে আরও একজনের। একে একে অন্যদের। পরে একসঙ্গে সবার।

তখন সুহাসিনী দাস বলে, রিলিফের কাজ করতে গিয়ে আমি যখন ওই বাড়িতে যাই তখন ওই বাড়ি থেকে এক টুকরো হাড় কুড়িয়ে আনি। পোড়াবাড়ির দেয়ালে লেখা ছিল—কুকুর চিত্ত, তোর উপযুক্ত শাস্তি হইল—আল্লাহো আকবর—মূর্তিপূজক হিন্দুদের ধ্বংস কর—পাকিস্তান কায়েম হইল, এইরকম আরও নানাকথা।

দাদু, আমি আর শুনতে পারছি না।

মধুরীলতা ফোঁপাতে থাকে। তখনো ভাসতে থাকে অদৃশ্য কণ্ঠস্বর—মানুষের মাঝে মানুষই তো থাকে। সকলে একরকম হয় না। যারা এই ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন তারা বলেছেন, একজন মুসলমান চিত্তবাবুর স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে রক্ষা করেছিলেন।

নোয়াখালীর দাঙ্গার দু'আড়াই মাস আগে দাউদাউ পুড়েছে কলকাতা। বাড়িতে-রাস্তায় বয়েছে রক্তগঙ্গা। প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। সংখ্যায় বেশি মুসলমানরা। মুসলমান নিধনের খবরে বেশি প্রভাবিত হয়েছে নোয়াখালীর মানুষ। ছেচল্লিশের কলকাতার রক্তস্রোতের পরিণতি নোয়াখালীর মর্মান্তিক নৃশংস পরিণতি।

ওহ মানুষ, মানুষ!

মাধুরীলতা চিৎকার করে বলে, কার কণ্ঠস্বর ? কে কথা বলছেন ?

আমি ক্ষুদিরাম। আমার বিপ্লবী। দেশের স্বাধীনতার জন্য বোমা হাতে নিয়েছিলাম। আমাদের জীবনে ঐক্যের মন্ত্র ছিল। আমরা সাম্প্রদায়িক নই।

তাহলে কে আমাদের সাম্প্রদায়িক করলো ?

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক স্বার্থ।

ক্ষমতার লোভ।

পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস।

আমরা তো এমন ছিলাম না।

কে বলছেন ?

আমি প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

আমরা জানি আপনাদের মতো এমন অসংখ্যজন আছেন যারা ধর্মের নামে মানুষের বিভাজন চান না।

আমি কি অন্যদের নাম বলব ?

না প্রীতি দিদি বলতে হবে না। আপনি স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন, তা আমরা জানি। স্বাধীনতা এসেছে দিদি। '৪৭-এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। তারপরও আমরা ভালো নেই। ধর্মের নামে রাজনীতি আমাদেরকে শেষ করে দিচ্ছে।

চারদিকে কান্নার রোল ওঠে। কোথাও কেউ নাই। সুবোধনাথ চোখ মুছে গলা থেকে কফ সরিয়ে বলে, ভূদেব বাবু বাড়ি চলুন।

বাড়ি ? দু'হাতে চোখ মুছে ভূদেব চিৎকার করে বলে, দাঙ্গায় মেয়ে হারিয়েছি। আর স্বাধীন দেশে আমার সম্পত্তি দখল হয়ে গেল। কারও কাছে বিচার চাইতে পারব না। ওহ, ভগবান!

ভূদেব দত্ত মাধুরীলতার হাত ধরে হনহন করে হাঁটতে থাকে। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। পেছনে ঘুরে বলে, তারপরও এ দেশেই থাকব। মৃত্যু আমি এই মাটিতেই চাই।

মাধুরীলতা সরাসরি তাকালে অনিমেষের চোখে চোখ পড়ে। হঠাৎ করে ওর মনে হয়, অনিমেষের সঙ্গে বুঝি ওর আর কখনো দেখা হবে না। অনিমেষ কোথায় হারিয়ে যাবে তা ও জানতে পারবে না। দেখতে পায় অনিমেষ বাবার হাত ধরে বলছে, বাড়ি চলো। ■

CHANNEL i
হাজারো রঙের ভিড়ে লাল-সবুজের বীজ বুনে যাই

AMARBOI.COM